তৃতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা উৎপল দত্তের নির্বাচিত নাটকের বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকগুলিতে নিহিত ও আলোচিত উৎপল দত্তের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস করেছি। যেহেতু আমাদের আলোচনা সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে, তাই নাটক নির্বাচনে এমন অনেক নাটককে আলোচনার বাইরে রাখতে হয়েছে, যেগুলি আলোচিত হওয়ার যোগ্য ছিল। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল উৎপল দত্তের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি বৃত্তান্তের প্রতিফলন। সুতরাং উৎপল দত্তের সময়কার অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষঙ্গের সার্বিক প্রতিফলন হয়েছে। উৎপল দত্তের সমসময়ে (১৯২৯-১৯৯৩ খ্রি.) যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি বাংলা তথা ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছিল, যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত যেসব নাটক রচনা করেছেন, সেইসব নাটক আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের মোট ১০টি নাটক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনা ও অনুষঙ্গের বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। যথা— ১) ফেরারী ফৌজ, ২) কল্লোল, ৩) অজেয় ভিয়েৎনাম, ৪) তীর, ৫) মানুষের অধিকার, ৬) ব্যারিকেড, ৭) দুঃস্বপ্নের নগরী, ৮) এবার রাজার পালা, ৯) লেনিন কোথায়, ১০) একলা চলো রে।

ফেরারী ফৌজ

প্রথম অভিনয় : ২৮ মে ১৯৬১, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থম, ৯ আগস্ট, ১৯৬১

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বাংলায় অগ্নিযুগের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নাটক লেখা হয়। এই দশকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় জেগে ওঠা যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়েই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। পূর্ব বাংলার যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ধরেছিল তাদের জীবন কাহিনি নিয়েই এই নাটক। বাংলার বিপ্লবীদের এই কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত

বাংলার ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। উৎপল দত্ত সেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী ছবি ফুটিয়ে তুললেন নিপুণ দক্ষতায়। র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্স বলতে যা বোঝায়— এই নাটকে উৎপল দত্ত তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করলেন। নাটকটি প্রযোজিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন বাঙালি দর্শকের কাছে এই নাটক ছিল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, বলা যায় তাদের চেতনায় এক বিদ্বোৎসাহী অগ্ন্যুৎপাত। এইরকম উত্তেজনাপূর্ণ, সংঘাতময়, ভায়োলেন্সে উত্তাল রাজনৈতিক নাটক বাঙালি দর্শক এর আগে প্রত্যক্ষ করেননি। উৎপল দত্ত বাংলার মানুষকে ১৯৩০-এর বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম, তাদের আত্মত্যাগ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করলেন, বাঙালির সংগ্রামী অতীত, বিপ্লবীদের জীবনকথা সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করলেন।

উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের নামকরণ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা থেকে। উৎপল দত্ত নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে 'নাট্যকারের কথা' অংশে তিনি বলেছেন—

> *'ফেরারী ফৌজ' নামটি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেয়া। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম এ নাটকে যুক্ত করতে আদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।*[১]

এই নাটকে ব্রিটিশ শাসন যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুটো দিক ফুটে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক দিকে চলছিল আপসহীন লড়াই এবং আরেকদিকে চলছিল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপস। এই সময়কার বাংলার বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী ইংরেজ ও রাজকর্মচারীদের হত্যা করে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করা। যাতে তারা ভীত হয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। ভয়-ভীতি সঞ্চার করে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার পরিকল্পনা ছিল এই বিপ্লবীদের। সেই গোপন বিপ্লববাদী দলের কাহিনি নিয়ে এই নাটকটি লেখা হয়েছে।

এই বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে সে সময়কার ব্রিটিশ সরকার ও তার অধীনস্থ রাজকর্মচারীরা চরম দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করেছিল। এই নাটকে সে সময়কার বিপ্লবী মানুষগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের বীরত্ব ও আত্মবলিদানের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় উৎপল দত্ত যখন 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এর হয়ে ইংরেজি নাটক করতেন, তখন ক্লিফোর্ড অভেটস্-এর একটি নাটক অভিনয় করেছিলেন— 'Till the day I die' যেটি ছিল বিপ্লবীদের আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে এই বিপ্লবী নাটকের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের মেঘনা নদী তীরবর্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রাম। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গ্রাম এতদিন এখনে বিপ্লবের কোনো গন্ধ ছিল না, সেখানেও জ্বলে উঠল আগুন। সবেমাত্র চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী যুবকদের ব্রিটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সমগ্র দেশের মানুষ উত্তেজনার আগুনে ফুটছে। সেই আগুনের আঁচ ভুবনডাঙ্গা গ্রামেও এসে উপস্থিত। এ নাটকে বিপ্লবীরা তাদের নেতা শান্তি রায়ের নির্দেশে একের পর এক ইংরেজ হত্যার ব্রত গ্রহণ করে এবং হত্যা করতে থাকে। কিন্তু বিপ্লবীদের অধিকাংশই তাদের নেতা শান্তি রায়কে কখনো চোখে দেখেনি। তারা নেতাকে চেনে না, তারা শুধু নেতার নির্দেশ শুনেছে ও হুকুম তালিম করেছে অন্ধভাবে। তাদের কাছে তাদের নেতা দেবতার সমান; নেতার নির্দেশ অকাট্য, শুধু নির্বিচারে আদেশ পালন করে যেতে হয়। তাদের মতে— "কীসের আপত্তি? শান্তিদার হুকুম—"[২] অথবা বিপ্লবী জ্যোতির্ময় এর মতে— "নর হ্যাভ্ ইউ। আউয়ার্স নট টু কোশ্চেন হোয়াই।"[৩] অর্থাৎ বিপ্লবী নেতা শান্তিদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বিপ্লবীদের একমাত্র কর্তব্য।

এই প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবেশে বিপ্লবী অশোক চাটুজ্যে পুলিশ সুপার উইলমট সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে গ্রামের গির্জার প্রাঙ্গণে। এই অন্ধ অনুসরণ ও প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবেশে বিপ্লবী অশোক চাটুজ্যে একটু ব্যতিক্রমী। সে প্রশ্ন তোলে—

অশোক।। এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?

কুমুদ।। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।

অশোক।। অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভ্যাড়ার সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে ঢুঁ মারতে শুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত।। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণজাগরণ তো হোলো না। মাঝখান থেকে—

[থেমে যান। কুমুদ তাঁর দিকে তাকায় রোষ ভরে]

কুমুদ।। জনতা ভ্যাড়ার সামিল একথা আমি বলিনি, অশোকদাই বলেছে। আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায়।

অশোক।। সে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখো তুমি?

কুমুদ।। আমি রাখি না, শান্তি দা রাখেন।

বিপিন।। নিশ্চয়ই

অশোক।। মাস্টারদা যেখানে পারেননি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তিদাও পারেন না। কোনো লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। [৪]

অশোকের মতের সঙ্গে অন্য বিপ্লবীদের মত মেলে না। কিন্তু তারা যুক্তিপূর্ণ তর্কের পথে না গিয়ে অশোককে নানাভাবে আক্রমণ করতে থাকে। তারা বলে—

আসলে অশোকদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উইলমট হত্যাটা হজম হয়নি এখনো। [৫]

এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে অশোক রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদ করে সে বলে—

বিপ্লবের জন্য যদি মারতে হয় মারবো। প্রশ্ন হচ্ছে এপথে বিপ্লব আসবে কী? [৬]

অশোক কখনো সংগ্রামের বিরোধী নয়, সে সংগঠনের বিরোধীও নয়, সে সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্য বিপ্লবীদের কাছে এসব প্রশ্নের কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজনও নেই। অশোক তুলে ধরার চেষ্টা করে বিপ্লবী আন্দোলনের গভীর সংকটের কথা। অন্য বিপ্লবীরা এ সংকট নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। কারণ তারা তাদের নেতার হুকুম তালিম করার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু অশোক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, তাই আক্ষেপ করে তাকে বলতে শুনি—

বিপিন আমার কথাটা বুঝলে না। In fact, লক্ষ্য করছি, আজকাল কেউই আমার কথা বুঝতে পারছে না। [৭]

অশোক সাচ্চা বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, পুলিশের শত নির্যাতনেও সে সংগঠনের কোনো কথাই ফাঁস করে না। পুলিশের শত অত্যাচারেও সে কোনো স্বীকারোক্তি দেয় না। পুলিশ অফিসার হিতেন দাসগুপ্ত অশোকের সামনেই তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে, তাতেও অশোক ভেঙে পড়ে না। তার কাছ থেকে কোনো তথ্য বার করতে না পেরে পুলিশ এক মোক্ষম চাল চালে। সুপরিকল্পিতভাবে বিপ্লবী অশোককে বিশ্বাসঘাতক সাজায়। তারা প্রচার করে অশোক পুলিশের কাছে সব কথা বলে দিয়েছে। তারা অশোককে দামি পোশাক পরিয়ে পুলিশের গাড়িতে পুলিশের বড় কর্তা জনসন সাহেবের পাশে বসিয়ে গোটা গ্রামে ঘোরায় যাতে গ্রামের মানুষ পুলিশের

প্রচারকে বিশ্বাস করে। পুলিশের এই পরিকল্পনা বিপ্লবীদের ও বিভ্রান্ত করে দেয়। তারা পুলিশের প্রচারকে বিশ্বাস করে ও অশোককে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করে এবং শাস্তি স্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুযোগ পেলেই অশোককে হত্যা করা হবে। প্রকৃত সত্য যে কী তা কেউ জানতে পারে না। যে শত্রুর কারাগারে ঘুমাতে পারে না, ঘুম পেলেই সে নিজেই দেয়ালে মাথা ঠোকে নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্য যাতে ঘুমের ঘোরে তার মুখ থেকে কোনো গোপন কথা না বেরিয়ে যায়, অথচ সেই বিপ্লবী অশোককে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া হয় বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে। প্রকৃত সত্য ও আক্ষেপ ধ্বনিত হয় অশোকের সংলাপে—

> *আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড়জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে; কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন।* [৮]

গোটা নাটকে অশোককে আমরা একজন সাচ্চা, উন্নতশীর, আদর্শবাদী বিপ্লবী হিসেবেই দেখি। নাটকের অন্তিমপর্বে দেখি শত অত্যাচার সে সহ্য করার পরেও বিশ্বাসঘাতকতা তকমা পাওয়ার পরেও বিপ্লবীদের সাহায্য করতে সে এগিয়ে আসে, তার ফলেই তার মৃত্যুও ঘটে। অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে উগ্রসন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করছিল তার সার্থক উদাহরণ হল অশোক চাটুজ্জ্যে। অনুশীলন সমিতির মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিপ্লবীরা আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকে দেখান বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা বিপ্লবের পথ থেকে পিছিয়ে আসে না। ১৯৩০-এর বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের পথ সঠিক ছিল কি না, তা নিয়ে বিদগ্ধ মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের গুরুত্ব রাজনৈতিক বিচারে কোনো অংশেই কম নয়।

আলোচ্য নাটকে আমরা দেখতে পাই বিপ্লবীদের মধ্য থেকেই অনেকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবীরা অশোককে বিশ্বাসঘাতক ভেবেছিল কিন্তু সে আদতে বিশ্বাসঘাতক

ছিল না। সে দলের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গিয়েছিল। অপরদিকে বিপ্লবীরা যাকে বিশ্বস্ত কমরেড বলে ভাবত, কুমুদকে। সেই কুমুদই ছিল বিশ্বাসঘাতক। নাটকের অন্তিমলগ্নে কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তি রায়সহ বিপ্লবী দলটি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং সংঘর্ষে তারা প্রাণ হারায়। সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক মানুষের আত্মম্ভরিতা ও বাগাড়ম্বরিতা বেশিই হয়। কুমুদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে বলে—

একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে। [৯]

দলের গোপন কোনো আলোচনায় কুমুদকে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে—‘ কখনো অশোকের বিরোধিতা করা কখনো বা শান্তি রায়ের আদেশকে মেনে চলার পরামর্শ দিতে দেখা যায় অন্যান্য বিপ্লবীদের। পুলিশ ইনস্পেকটর হিতেন দাশগুপ্তের মেয়ে দেবযানী দাশগুপ্তের সঙ্গে তার প্রেমকাহিনি জানার পর বিপ্লবী দলের সকলে যখন আশঙ্কা প্রকাশ করে তখন সে ফেটে পড়ে উত্তর দেয়—

সে আমি জানি জানি, আমাকে আর বিপ্লব শেখাতে হবে না। সব জানি আমি। [১০]

নাটকের শেষ লগ্নে আমরা দেখি বিপ্লবী নেতা শান্তি রায়ের নির্দেশে ও পরিকল্পনায় জাহাজঘাটায় স্টীমার কোম্পানির তেলের গুদামে জনসন সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনার গোপন কথা কুমুদ মুখোপাধ্যায় সবকিছুই ফাঁস করে দেয় পুলিশের সাব ইনস্পেকটর প্রকাশ মুখুটির কাছে। দলের সমস্ত পরিকল্পনা নখদর্পণে সে জেনে নেয়। যখন শান্তি রায় আত্মপ্রকাশ করেন তখন তার সম্পর্কেও খুঁটিনাটি নানান তথ্য কুমুদ জেনে নেয়। সেই সমস্ত তথ্য সে পুলিশ অফিসারের কাছে প্রকাশ করে এবং সদলবলে বিপ্লবীদের হাতেনাতে ধরিয়ে দেয়—

প্রকাশ।। এই নোট্‌টা আপনি পাঠিয়েছিলেন থানায়?

কুমুদ।। হ্যাঁ।

প্রকাশ।। আপনার নাম?

কুমুদ।। কুমুদ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ।। কখন আসার কথা?

কুমুদ।। রাত দুটোয়।

প্রকাশ।। সত্যি কথা বলছেন তো?

কুমুদ।। একটু পরে স্বচক্ষেই দেখবেন?

প্রকাশ।। মিথ্যে হলে বুঝবেন ঠেলা। শান্তি রায় থাকবে?

কুমুদ।। হ্যাঁ। তবে চিনতে পারবেন না, আমি জানি।

প্রকাশ।। কেন?

কুমুদ।। সে আপনাদের প্রিয়পাত্র, বন্ধু নীলমণি বাঁড়ুয্যে।

[সবাই সচকিত]

প্রকাশ।। তাহলে! তবে—। ভালরে ভাল। চিঠিতে আরো বলছেন ইনস্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারব। কি তথ্য?

কুমুদ।। তাকে গুম করা হয়েছে। রাধারানীর ঘরে।

প্রকাশ।। দেবব্রত ঘোষের লুকিয়ে থাকার খবরটা আপনিই দিয়েছিলেন?

কুমুদ।। হ্যাঁ।

প্রকাশ।। থ্যাংকস। (ঘড়ি দেখেন) সময় বেশি নেই।

কুমুদ।। লুকিয়ে পড়ুন। দোহাই আপনাদের, লুকিয়ে পড়ুন। ওরা আসবার আগে।

[প্রকাশ মৃদুস্বরে নির্দেশ দেন। বন্দুকধারীরা এদিক ওদিক গা ঢাকা দেয়।]

প্রকাশ।। কেন এ কাজ করছেন?

কুমুদ।। কি?

প্রকাশ।। এ কাজ করছেন কেন?

কুমুদ।। সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

প্রকাশ।। একটা দেশপ্রেমিক বীরকে আমাদের হাতে সঁপে দিচ্ছেন?

কুমুদ।। আপনি না পুলিশ অফিসার?

প্রকাশ।। ওহো! সেটা ভুলে গেসলাম। ভেতো বাঙালী তো, বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

কুমুদ।। আমার সর্বনাশ করছে ওরা। আমার সব কেড়ে নিয়েছে। মানুষের মনকে ওরা বিকৃত করে

দেয়। ... লুকিয়ে পড়ুন। আর দেখুন, আমি সিগনাল না দিলে ঢুকবেন না— প্লীজ! ।[১১]

উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার উপস্থাপনায় ও চরিত্র সৃষ্টিতে চমকের পর চমক সৃষ্টি করেছেন। দর্শককে নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বারবণিতা রাধামণির চরিত্রটি খুবই জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তার জীবিকার অন্ধকার পথের মধ্যেও সে এই বিপ্লবী দলের কর্মীদের সান্নিধ্যে জীবনে কোথাও না কোথাও একটুখানি যে আলোর সন্ধান পেয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হিসেবে নিজের ঘরকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। শুধু তাই নয় পুলিশ ইনস্পেকটর হিতেন দাশগুপ্তকে সে সুকৌশলে হত্যা করেছে তার গোপন আস্তানায়। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখতে পাই বারাঙ্গনা রাধার ঘরে যখন পুলিশের তল্লাশি চলছে, তখন বিপ্লবীদের সহকর্মী রাধামণি পুলিশের কাছে বিপ্লবীদের যাবতীয় তথ্য ও নাম বলে দেয়—

রাধা।। সে তো জানি না। বাবুরা সব বলাবলি করছিল। বলো, কথা দাও আমাকে বাঁচাবে।

হিতেন।। হ্যাঁ, বাঁচাব, সব যদি বলো।

রাধা।। বলছি তো।

হিতেন।। কে কে আসে এখানে?

রাধা।। একজনের নাম শুনেছি দেবব্রত ঘোষ, তাকে সবাই মাস্টার মশাই বলে ডাকে।

হিতেন।। গুড হেভেন্‌স্! আমারও মাস্টারমশাই তিনি। তিনি ঐ ডাকাতদের দলে। আর কে?

রাধা।। জ্যোতির্ময় লাহিড়ী।

হিতেন।। জানতাম। এর ওপর নজর আছে আমাদের। আর?

রাধা।। কুমুদ মুখুজ্যে। বাচ্চা ছেলে।

হিতেন।। কুমুদ? জগন্নাথ মুখুজ্যের ছেলে কুমুদ। আমার মেয়েকে চিঠি লিখতো? সে! আশ্চর্য! (আনন্দে) আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, খোঁদি। আর কে?

রাধা।। আর শান্তি রায়।

হিতেন।। অ্যাঁ। এ ঘরে।

রাধা।। হ্যাঁ। রোজ আসেন।[১২]

একটু পরেই দেখা যায় রাধারানী তার মোহিনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশ অফিসার হিতেন

দাশগুপ্তকে বিষ মেশানো পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান করে দেয় এবং ঘরে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবীদের বলে—

> *রাধা।। বিষ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। সব জেনে গেছে। ওকে মেরে ফেলুন। এঘর থেকে ওকে জ্যান্ত বেরুতে দেবেন না ওকে সব বলেছি। সব বলে ফেলেছি। নইলে খেত না কিছুতেই।* [১৩]

নাট্যকার উৎপল দত্ত রাধার মতো স্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন, যে পরাধীনতার হীনমন্যতার কলুষতার মধ্যে নিজের জীবনের অন্ধকারকে দেখতে পেয়েছিলেন। অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতির মধ্যে রাধারানীর মতো স্বাধীনতাকামী অনেক নারী চরিত্রের উপস্থিতি ছিল। যারা পুরুষের পাশাপাশি নিজেরাও বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার ব্রতে। রাধামণি সেই বিপ্লবীদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নাটকের সবচেয়ে বড়ো চমক— নাটকের শেষভাগে বিপ্লবী শান্তি রায়ের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়া। নাটকের গোড়া থেকে যাকে দর্শক জেনে এসেছে পুলিশের বিশ্বস্ত গুপ্তচর হিসেবে, সেই নীলমণিই দেখা যায় আসলে শান্তি রায়। এই শান্তি রায় তার পূর্বের ক্রিয়া কর্মের জন্য ব্রিটিশ পুলিশের হাতে এগারো বছর রাজবন্দী হয়ে ছিল। সে কি করে সেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের ওই গুপ্তচর হয়ে গেল এবং গুপ্তচরের আড়ালে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে গেল তা নিয়ে দর্শকদের কাছে একটু ধোঁয়াশা থেকেই যায়। যাইহোক, উৎপল দত্তের চমক সৃষ্টির নৈপুণ্য স্বীকার করতেই হয়। অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতির সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা উৎপল দত্ত এই নাটকে তুলে ধরেছেন। অনুশীলন দলের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনকে এদেশ থেকে উৎখাত করা। শান্তি রায় চরিত্রটির মধ্যে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তাকে বিভিন্ন ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হয়। গোপনভাবে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং বিপ্লবীদের সঠিক পথে নেতৃত্ব প্রদান করে বিপ্লবের অভিমুখ নির্ধারণ করতে হয়।

উৎপল দত্ত নাটকে শ্রেণিশত্রুর চক্রান্ত দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। অশোক একজন সাচ্চা বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে শ্রেণিশত্রুর চক্রান্তে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হতে হয়। সত্য ঘটনা না জেনে তারা অশোককে দেখা মাত্রই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। বিশেষত, ছদ্মবেশী বিপ্লবী কুমুদ তার শাস্তির বিষয়ে অতি সক্রিয়তা দেখায়। উৎপল দত্ত শ্রেণি সংগ্রামের বিষয়টিকেও উপস্থাপনা করেন আলোচ্য নাটকের মধ্য দিয়ে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই সিরাজুলদের মতো মাঝিমাল্লারা বিপ্লবীদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছে, তারাও বিপ্লবের অংশীদার হয়েছে।

বিপ্লবীদের কাজ সমাধা হওয়ার পর অর্থাৎ ইংরেজদের হত্যা করার পর তারা ইস্টিমারে করে পালাতে চাইলে সিরাজুল তাদেরকে সহায়তা করার সম্মতি জানায়। সিরাজুল বলে—

> *সিরাজুল।। পারুম। মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ। দুইখানা ইস্টীমারের প্রায় প্রত্যেকটা মাল্লা, সারেং, টিন্ডাল দলে আইছে।*[১৪]

'শ্রেণিসত্য' বা 'ক্লাসট্রুথ' বিষয়টিকেও তিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংল্যান্ডের রানীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট এবং বারাঙ্গনা রাধারানী দেবী এক হয়ে যায় যায়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে জ্যোতির্ময়ের কথায় সেকথা প্রকাশ পায়—

> *তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলন্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনডাঙার রাধারানী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড।*[১৫]

ত্রিশের দশকের সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের পারস্পরিক যে বিবাদ-দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বকে নিয়েই উৎপল দত্তের নাটক 'ফেরারী ফৌজ'-এর ঘটনা পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই ছিল সেইসময়কার প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে পশ্চিমবাংলার জাতীয় জীবনে হতাশা ও রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের তাণ্ডব নেমে এসেছিল বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপরে। এই রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপরে অত্যাচারের পটভূমিকায়, উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের মধ্য দিয়ে এই দেশের ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালির মুক্তি সাধনার কথা নাট্যকার বলেছেন ও বাঙালির চেতনাকে উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার উৎপল দত্তের এটি একটি বড়ো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্যকে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলেন যাতে রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই নতুন ধরনের, নতুন স্বাদের থিয়েটারের প্রতি বাঙালি দর্শককে আকৃষ্ট করে তোলাটা ছিল তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায়কে উৎপল দত্ত বারে বারে তাঁর নাটকের বিষয় করেছেন। অতীতের সংগ্রামের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সংকটের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। 'ফেরারী ফৌজ' থেকে তার সূত্রপাত।

কল্লোল

প্রথম অভিনয় : ২৮ মার্চ ১৯৬৫, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থম, এপ্রিল ১৯৬১

'কল্লোল' নাটকের খসড়া উৎপল দত্ত তৈরি করেছিলেন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। আর এটি প্রথম অভিনীত হল ২৮ মার্চ ১৯৬৫ খ্রি., মিনার্ভা থিয়েটারে। বিখ্যাত রাশিয়ান নাট্যকার ও পরিচালক অখলোপকভ-এর নাটক 'দি ওশান' নাটকটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল Tretyakov-এর 'Roar China' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে 'কল্লোল' নাটকে। চীনা নৌসেনাদের বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'Roar China' নাটকটির অংশ বিশেষ পরিলক্ষিত হয় 'কল্লোল' নাটকে।

'কল্লোল' নাটকের বিষয়বস্তুরূপে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের বোম্বাই-এর নৌ বিদ্রোহকে গ্রহণ করা হয়; যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। 'কল্লোল' যে শুধু একটা নাটক নয়, এটা হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষব্যাপী এক বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন, এই নাটককে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে গড়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনীতির উত্তাল জনজোয়ার। 'কল্লোল'-কে বন্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচার, পুলিশি সন্ত্রাস, গুণ্ডাদের জুলুম প্রভৃতি নেমে এসেছিল নাট্যকর্মীদের ওপরে। আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত দেখাতে চেয়েছেন কিছু স্বার্থপর, লোভী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় কীভাবে সর্বাত্মক আন্দোলন দমিত হয়, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কীভাবে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, তাদের কঠোর সংগ্রাম, তাদের বলিদান স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়ে অবদমিত হয়, তা তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য নাটকে। 'কল্লোল' সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> *কল্লোল নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্বগাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই, এ-কথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল। ... নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে।* [১৬]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের ঘটনাই 'কল্লোল' নাটকের অবলম্বন। নাটকের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক কৌশল ও কূটনীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস উৎপল দত্ত সুকৌশলে আলোকপাত করেছেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মি'-র ভারতীয় নৌসেনারা উনিশবার বিদ্রোহ

করে। এইসব বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকরা চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ নৌবিদ্রোহের পর আবার নৌবিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে গর্জে উঠেছিল। নাটকটি 'খাইবার' নামক জাহাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। 'খাইবার'-এর নাবিকদের জীবন কাহিনি, তাদের সংগ্রামকে দেখানো হয়েছে। অবশ্য 'খাইবার' নামক জাহাজেই সব বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছিল, তা নয়। 'খাইবার' এখানে প্রতীকধর্মী। 'খাইবার' এখানে সব বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধি।

নাটকের সময়কাল ১৯৪৬ খ্রি.। এইসময় দুশো বছর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্ মুহূর্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, সারা দেশ স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের টাটকা অভিজ্ঞতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' দিল্লি চলো অভিযানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, পরাজিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তি আন্দোলন, ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট, সারাদেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছিল। এইসব প্রেক্ষাপটগুলিতেই নৌবিদ্রোহকে দেখতে হবে।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর ভারতীয় নৌসেনারা ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি 'তলোয়ার' জাহাজের সেনারা পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজ থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকা নামিয়ে দেয়। সেখানে তারা কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উত্তোলন করে। বোম্বাই-এর রাজপথ পরিক্রমা করতে থাকে উক্ত তিন পতাকা নিয়ে। তাদের দাবির মধ্যে ব্যক্তিগত ও চাকরিগত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার কথাও। নৌসেনাদের রাজনীতিগত দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল তাদের ভালো খাবার দিতে হবে ও ইংরেজ নাবিকদের সঙ্গে বৈষম্য দূর করতে হবে। আরও দাবি ছিল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর ধৃত বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈনিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সর্বশেষ এবং প্রধান দাবি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

'কল্লোল' নাটকে এই ঐতিহাসিক ঘটনার জীবন্ত কাহিনি তুলে ধরা হল। নৌসেনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের কাহিনিই এই নাটকের প্রধান বিষয়। এই সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের পাশাপাশি উৎপল দত্ত দেখালেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুটিল ষড়যন্ত্র ও শাসন ও

শোষণের হিংস্র তাণ্ডব। সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপল দত্ত দেখালেন এদেশীয় রাজনীতি বিদ্বেষ চরম স্বার্থপরতা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দু'মুখো নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা। নাটকের শুরুতেই দেখি সূত্রধারের দীর্ঘ ভাষণ। গোড়াতেই তার ভাষণের মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছে নাটকের মূল বক্তব্যটি। নাবিকদের সশস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলনের গুণকীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছে অহিংস আন্দোলনের অসাড়তা এবং তার প্রতি বিদ্রূপ প্রতিভাসিত হয়েছে।

> *শোনা গেল ওদের দিগন্ত কাঁপানো ঢক্কানিনাদ, ইতিহাস মিথ্যা, সংগ্রাম মিথ্যা, মিথ্যা মানুষের আত্মত্যাগ, সত্য শুধু অহিংস বিপ্লব, ভারত স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে।।...*
>
> *সারা ভারতে গুলিতে নিহত মজদুর আর কিষাণের ঝাঁক ওরা সবাই ছোটলোক, টাকা কড়ি কোথায়, কোথায় বিষয় আশয়, দেখতে কদাকার, গায়ে নেই দামী খদ্দরের পাঞ্জাবি, পুনার আকাশচুম্বী আগা খাঁ প্রাসাদে ওরা কি অনশন করেছিল? তাই ওদের রক্ত নয়, নয়া ইতিহাসে ওদের থাকবে না স্থান।* [১৭]

এরপর সূত্রধারের গানের মাধ্যমেই ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, যে আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দেয় নৌবিদ্রোহকে—

> *আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি।*
>
> *অহিংস ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে,*
>
> *এই নিভৃত কক্ষে আপনাদের বলি—*
>
> *কোত্থেকে এল এই স্বাধীনতা।*
>
> *যতই সাবান দিয়ে কেচে*
>
> *ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি,*
>
> *আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল,*
>
> *বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে।।* [১৮]

নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নাবিকদের নিয়ে যুদ্ধজাহাজ 'খাইবার' চলেছে ইতালির বিখ্যাত বন্দর জেনোয়ার দিকে এক যুদ্ধ যাত্রায়। সঙ্গে রয়েছে ব্রিটিশদের বৃহৎ নৌবহর, কিন্তু তারা 'খাইবার' জাহাজকে সামনে এগিয়ে দেয়, কারণ তাদের মনোভাব এমন ছিল যে সমস্ত আক্রমণ খাইবারের উপর দিয়েই হয়ে যাক। সূত্রধারের

গানে সেকথা প্রকাশ পায়—

শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড় দুর্ধর্ষ

কালা নাবিকদের ওপর দিয়েই যাক তাদের অগ্নিবর্ষণ।

কালা নাবিকদের রক্ত রক্ত নয়। [১৯]

দ্বিতীয় দৃশ্যেই আমরা সার্দূলের কথাতেই জানতে পারি যে, ইউরোপের এক যুদ্ধে তারা ফ্রান্সের উপকূলে নাৎসিদের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছিল। তারপর তারা নাৎসিদের অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছিল। সার্দূলের কথায়—

দিনের পর দিন জর্মন বন্দীশিবিরে গরম লোহার ছ্যাঁকা খেয়েও বেঁচে আছি। ঐ শীতে শুধু জল আর রুটি খেয়ে বেঁচে থেকেছি। [২০]

জার্মানিদের অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে সার্দূল আরও বলে—

আর মার যা মারলো না! কালা নাবিকদের উপর জর্মন নাৎসিগুলোর বেশি রাগ। বলে আমরা নাকি আধা মানুষ আধা বাঁদর।... চাবুক মেরে কুমীরের পিঠ করে দিয়েছে। [২১]

উৎপল দত্ত প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্যের এই অংশে সুকৌশলে 'কালা নাবিক' অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের অত্যাচার ও নাৎসিদের অত্যাচারকে এক ও সমগোত্রীয় করে দেখিয়েছেন। নাবিকরা যেমন নাৎসিদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে, তেমনি ব্রিটিশরাও তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার করেছে। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের অত্যন্ত নীচ ও হীন মনোভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করত। সেই সঙ্গে চলত ভারতীয়দের উপরে অকথ্য অত্যাচার ও নোংরা ভাষায় গালাগালি। নাটকে আমরা ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয়দের সম্পর্কে অনবরত বলতে শুনি—

তুমি তো ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান জাতটাই নোংরা। ওরা মোষের মতন কাদায় পড়ে থাকতে ভালোবাসে। অথবা, 'ডার্টি নিগার সোয়াইন'।... স্বপ্নেও ভেবো না তোমাদের বিশ্বাস করবো। ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস করা আদৌ আর সম্ভব নয়। [২২]

ব্রিটিশ শাসকদের ভয়াবহ অত্যাচার ও অকথ্য গালিগালাজ ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সমস্ত নাবিকেরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটী নাবিকদের মূল ঘাঁটি 'তলোয়ার' জাহাজ থেকে সাংকেতিক বেতার বার্তায় ঘোষণা করা হয়—

যদি দেশকে ভালোবাসো

যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো,

তবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

নৌবহরের হরতালে শামিল হও। [২৩]

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই নাবিকরা যখন হরতালের ডাক দিয়েছিল তখন 'খাইবার' জাহাজ যাচ্ছিল করাচির অভিমুখে। 'তলোয়ার'-এর আহ্বানে 'খাইবার' করাচিতে না গিয়ে বোম্বাই, বর্তমানে মুম্বাই ফিরে এল ও হরতালে যোগ দিল। 'খাইবার'-এর মধ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা 'পিপিলস এজ' পত্রিকার একটা কপি হাতে পায়, এটি তাদের মতে রাজদ্রোহমূলক। এই পত্রিকার অংশ কীভাবে সামরিক জাহাজে এল তার কারণ অনুসন্ধান করতে ব্রিটিশ অফিসাররা নাবিকদের ওপরে চরম অত্যাচার চালায়, একজনকে বন্দিও করে। এহেন পরিস্থিতি সার্দূলের অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, হাতে মেশিনগান তুলে নেয়, একজন অফিসারকে জখমও করে বাকিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তৃতীয় দৃশ্যটি খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় জাহাজে পত্রিকার অংশ নিয়ে আনার বিষয়টি তাদের পূর্বপরিকল্পিত কৌশল যাতে ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে তাদের সংঘাত সৃষ্টি হয় ও যার ফলে তাদের বোম্বাই ফেরার পথ পরিষ্কার হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি বেলা ২টো পনেরোয় সর্বাত্মক হরতাল সংগঠিত হবে তার পূর্ব পরিকল্পনা আগে থেকেই তাদের ছিল। এই দৃশ্যে সার্দূল সিং-এর সশস্ত্র প্রত্যাঘাতের দ্বারা একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম করা ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মাধ্যমে উৎপল দত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন— অস্ত্র ছাড়া জয় নেই সাম্রাজ্যবাদকে দমন করতে গেলে দেশকে স্বাধীনতা দিতে গেলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া কোনো পথ নেই—

সার্দূল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্টং। আপনাদের ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হোলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রগুলো ডেকে রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন। নইলে মেশিনগান চালিয়ে চালিয়ে আপনাদের তিনজনকেই শেষ করে দেব।

[নীরবতা। তারপরই রেটিংরা আওয়াজ তোলে সাম্রাজ্যশাহী যে বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।]

ডেন।। স্ট্যান্ড ব্যাক। স্ট্যান্ড ব্যাক, ইউ জামড মিউটিনিয়ার্স, অর আই উইল ব্লো ইওর ব্রেনস্ আউট।

আর্ন।। গানার সার্দূল সিং। এ কি করলে? ভারতীয় নৌবাহিনীর নামে কলঙ্ক লেপন করলে? ডেনহাম, অস্ত্রাগারে যাওয়ার চেষ্টা করো। সার্দূল সিং, আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে টার্গেট থেকে নেমে এস।

[ডেনহাম দৌড় মারতেই সার্দূলের মেশিনগান গর্জে ওঠে। ডেনহাম ছিটকে পড়ে যান। জাহাজীরা আবার আওয়াজ তোলে।]

সার্দূল।। ক্যাপ্টেন আর্মস্টং, অস্ত্র ফেলে দিন বলছি নইলে দেখলেন তো, মেরে ফেলবো?

[ডেনহাম কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।]

আর্ম।। রক্তপাত করলে? তোমরা বৃটিশ-রক্তপাত করলে। বেশ, এখনকার মতন আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।। [২৪]

'খাইবার' জাহাজের নাবিকেরা স্লোগান তোলে ভারতের পরাধীনতা থেকে মুক্তির এবং ব্রিটিশের ভারত ছাড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে।—

সাম্রাজ্যবাদী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। [২৫]

গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হতে থাকে। সেগুলি সব গোপনে ফ্রটিয়ার বস্তিতে সার্দূল সিং-এর মা কৃষ্ণা বাঈ-এর কাছে জমা হতে থাকে—

ঝোলার মধ্যে ছ'টা কোল্ট রিভলবার আছে আর কার্তুজ। রেখে দাও। [২৬]

কিন্তু নীতির প্রশ্নে কিছু গোলমাল দেখা যায়। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠে সার্দূলের ও জাহাজের নাবিকদের। নাবিকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়তে যায়। তা নিয়ে সার্দূলের সঙ্গে সাকসেনার তর্ক শুরু হয়—

সার্দূল।। ও মানে— মাপ করবেন কমরেড, আমরা সমুদ্রে থেকে বোধহয় ঘটনার খেই হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ধারণা ছিল এটা স্বাধীনতার লড়াই। আমাদের ধারণা ছিল দাবী হবে একটাই— ভারত ছাড়ো— বিনা শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।...

সাকসেনা।। দেখুন, এ লড়াই সারা ভারতের লড়াই। কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলবে এই লড়াই। তাই কোনমতেই আমরা রক্তপাত ঘটতে দেব না। রক্তপাতে ইংরেজেরই লাভ। সংকীর্ণ দৃষ্টি ত্যাগ করুন। সারা ভারতের অহিংস লড়ায়ের সঙ্গে খাইবার-এর লড়াইকে মিলিয়ে দিন।

সার্দূল।। বোম্বায়ের সাধারণ মানুষ? তারা জানতে পারছে তো সব খবর?

সাকসেনা।। হ্যাঁ, কাল সাধারণ ধর্মঘট। তবে সেটা ভুল হয়েছে। অমার্জনীয় ভুল। বৃটিশ ফৌজে বোম্বাই এখন ঠাসা। গুলি চলবেই। তাই কংগ্রেস এই সাধারণ ধর্মঘটকে নিন্দা করছেন।

সার্দূল।। (জ্বলে ওঠে) কী বললেন? নাবিকদের সমর্থনে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামছে, তাকে— তাকে কংগ্রেস নিন্দা করছে?

সাকসেনা।। হ্যাঁ। আপনারা কি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াই লড়বেন নাকি? সে ক্ষমতা আছে? সর্দার

মগনলাল কাল সন্ধ্যেবেলায় বোম্বাই পৌঁছেছেন, তিনি নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনারা কি তাঁকে বাদ দিয়েই লড়াই চালাবেন? [২৭]

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেমন 'খাইবার' জাহাজে চলে তেমনি জলের সংগ্রাম স্থলভাগেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশরাও ফ্রন্টিয়ার বস্তিতে অত্যাচার চালাতে থাকে নাবিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। খাইবার জাহাজের নাবিকরা দুরবিন দিয়ে দেখে গোরা ফৌজরা কাসল ব্যারাক আক্রমণ করেছে, নিরস্ত জাহাজীদের ও তার পরিবারবর্গদের নির্মমভাবে গুলি করে মারছে। বিপদ বুঝে এবার বস্তির মানুষরাও নারী পুরুষ অবাধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। এদিকে তলোয়ারের সঙ্গে খাইবার যোগাযোগ করে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পায় না। নাবিকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়, পালটা গুলি চালাতে হবে, নিরস্ত্র জাহাজীদের প্রাণ বাঁচাতে হবে।—

সার্দূল।। টারেট আকবর ক্লিয়ার? টারেট আকবর ক্লিয়ার। টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার? টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার। টারেট আকবর, হুমায়ুন, ইনকিলাব ক্লিয়ার।

রাজ।। তলোয়ারের সাড়া নেই যে।

সার্দূল।। চেষ্টা করো। আবার চেষ্টা করো।

সিগ্‌ন্যালার।। হ্যালো তলোয়ার, হ্যালো তলোয়ার, হ্যালো তলোয়ার—

রাজ।। বেয়নেট চার্জ করে মারছে—

সার্দূল।। টারেট আকবর থ্রী ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ ওয়ান জিরো—

রাজ।। কি করছো? কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছাড়া গুলি চালাব? সাকসেনা কি বলে গেলেন শুনলে না?

সার্দূল।। ওখানে আমার কমরেডরা দাঁড়িয়ে মরছে! [২৮]

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে সার্দূল গুলি চালায়। নিরস্ত্র জাহাজীদের ওপর গোরা সৈন্যদের বর্বরোচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে গোরা সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করে—

দূরাগত কোলাহল চেপে খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে।... দুষমনের মেশিনগান পোস্ট ধ্বসে গেছে। টারেট হুমায়ুন রেঞ্জ নাইন ফোর অট অট অট টু গ্রীণ স্যালভো। দুষমন পালাচ্ছে। [২৯]

আসলে উৎপল দত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে ও তাদের থেকে দেশকে স্বাধীন করতে গেলে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সজোরে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে তিনি সহমত পোষণ করেন।

'কল্লোল' নাটকে প্রাক্তন জাহাজী সুভাষ দেশাই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত শ্রেণিসংগ্রাম বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। কাসল ব্যারাক-এর বিপন্ন জাহাজীদের বাঁচাতে গিয়ে এবং গোরা ফৌজকে পিছু হটাতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল এক সংকীর্ণ প্রণালীতে। তৎক্ষণাৎ পাঁচটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সেই প্রণালীর মুখ বন্ধ করে দেয়। খাইবার হয়ে পরে বহির্জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সুভাষ দেশাই এগিয়ে আসে খাইবারের নাবিকদের রক্ষাকর্তা হিসেবে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি থেকে সুভাষ দেশাই খাইবারে খাদ্য পৌঁছে দেয় গোপনে সাঁতার কেটে, তাঁর একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে খাবার পৌঁছে দেয় খাইবার জাহাজের ক্ষুধার্ত নাবিকদের কাছে।—

সুভাষ।। লক্ষ্মী গোনো। চাপাটি পঞ্চাশটা, শিক কাবাব— গোনো—

লক্ষ্মী।। এসব কেনো?

সুভাষ।। খাইবার জাহাজের জন্য খাবার দরকার হলে সাঁতরে গিয়ে দিয় আসবো। [৩০]

সুভাষ দেশাই জানে যে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিকে রক্ষা করার জন্য খাইবার জাহাজ বিপদে পড়ে। তাই খাইবার জাহাজের নাবিকদের বিপদে সুভাষ দেশাই স্থির থাকতে পারে না, তার একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রেণি সংগ্রামে এগিয়ে আসে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যখন নাবিকদের কায়দা করা যাচ্ছে না, বিদ্রোহ আরও ক্রমাগত ব্যাপক আকার ধারণ করছে, বোম্বাই-এর সাধারণ মানুষ নৌবিদ্রোহের সমর্থনে রাস্তায় নামে, বামপন্থীরা নাবিকদের দাবির সমর্থনে পরপর দুদিন গোটা বোম্বাই-এ ধর্মঘটের ডাক দেয়, তখন কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা চক্রান্ত ও কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতা মগনলাল বাজোরিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্যাপ্টেন আর্মস্টং, অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে ও ডেনহাম অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে-র বাংলোয় জরুরি বৈঠকে উপস্থিত হন। সেখানে তৈরি হয় বিদ্রোহীদের দমন করার নানা রকম চক্রান্তের নকশা ও ক্ষমতা লাভের নির্লজ্জ লিপ্সা। আলোচনায় কংগ্রেস নেতা মগনলাল, উদ্দেশ্য ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থেও বোম্বাই-এ গুলির লড়াই বন্ধ হোক। কংগ্রেস নেতা ও ব্রিটিশ অফিসারদের কথোপকথনে শাসক শ্রেণির অন্দরমহলের ধূর্ত ও নির্লজ্জ অভিসন্ধির স্বরূপ উন্মোচিত হয়।—

আর্ম।। আমি পড়ে দিচ্ছি, এতে বলছে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বামপন্থীদের কবলে চলে যাচ্ছে, ফলে এই দেশে আর টাকা লগ্নী করা উচিত কিনা তারা ভাবছেন।

এখান থেকে ব্যবসা গোটানো উচিত কিনা তাঁরা বিবেচনা করছেন।

র‍্যাট।। কতকগুলো মুনাফাবাজ কি ভাবছে আর বিবেচনা করছে তা ভাবার আর সময় নেই। আমার কাজ বোম্বাইকে ঠেঙানো, ঠেঙাবো।... পুরো বম্বে বামপন্থীদের হাতে চলে গেছে, এ অবস্থায় গুলি চালাবো না?

মগন।। বামপন্থীদের হাতে যায়নি এখনো, যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যত আপনি গুলি চালাচ্ছেন তত সেই সম্ভাবনা দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

আর্ম।। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক স্যার।

মগন।। ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক পরে হবে। বৃটেনের লেবার পার্টির সরকার কী চায়? তারা কি এখানে কমিউনিস্টদের হাত জোরদার করে তবে স্বাধীনতা দেবে? তাহলে পরের দিনই আই সি-আই আর লিভার ব্রাদার্স-এর বিশাল সংগঠনকে দখল করে ওরা বৃটিশ মালিকদের জেলে পুরবে। আমরা জাতীয়করণ করলে ক্ষতিপূরণ দেব। জাতীয়করণও হয়তো করবো না বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে আমাদের কোন কলহ নেই। বরং ভারতীয় পুঁজি আর বৃটিশ পুঁজি বেশ গলাগলি করেই বাঁচতে পারে।...

র‍্যাট।। ও, বি কোয়ারেট আর্মস্টং। বৃটিশ পুঁজি টিকবে ভাবছো কেন? কোথায় গ্যারান্টি?

মগন।। আমরা গ্যারান্টি। কংগ্রেস গ্যারান্টি।

র‍্যাট।। ইন্ডিয়ানদের আমি বিশ্বাস করি না।

মগন।। আপনার অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। আপনার বাবারা বিশ্বাস করেন। তাই ওঁরা চান পুরো দেশের আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে কংগ্রেস আর লীগের হাতে লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের হাতে না। [৩১]

উৎপল দত্ত স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিচ্ছে। ভারত থেকে ব্রিটিশ পতাকা সরিয়ে নিচ্ছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কৃতিত্ব ও নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাত তুলে দিচ্ছে। ব্রিটিশ পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজির স্বার্থ যাতে কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ অফিসারদের গ্যারান্টি দিচ্ছে।

নাটক এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য হীন চক্রান্ত ও নির্লজ্জ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা মগনলালের মতে সঠিক রণকৌশল হল খাইবারের ওপরে গুলি না চালিয়ে সুকৌশলে খাইবারকে অন্য জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আবার সাকসেনার নেতৃত্বে অন্যসব জাহাজের নাবিকেরা যেসব দাবি তুলেছে সেগুলোর কয়েকটা আপাতত মেনে নিতে হবে কৌশল হিসেবে। খাইবার ছাড়া বাকি জাহাজের নাবিকেরা এটাকে

তাদের জয় হিসেবে গ্রহণ করবে ও তারা ধর্মঘট তুলে নেবে এবং খাইবার জাহাজ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটা ছিল মগনলালের পরামর্শ।

এরপর দেখি ধর্মঘটি নাবিকদের মূল ঘাঁটি তলোয়ার জাহাজ থেকে খাইবারকে জানানো হয় যে নাবিকদের অধিকাংশ দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে। নাবিকরা এটা তাদের জয় হিসেবে দেখছে তাই তারা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে। একথা শুনে খাইবর জাহাজের নাবিকেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা অপ্রত্যাশিত হয়ে পড়ে। তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে চায় না, কারণ এটা তাদের ছিল স্বাধীনতার লড়াই।—

রাজ।। কি লাভ হবে? এখন আমরা একা।

সার্দূল।। অত লাভ লোকসান হিসেব করে লড়াই করতে আসিনি।

গফুর।। আমারও তাই মত।

অগ্নি।। তোমার মা মারা গেছেন বলে তুমি বেশী রেগে আছ।

রাজগুরু।। সার্দূল, এতগুলো জীবন!

সার্দূল।। এই কটা জীবন! কি এমন অমূল্য জীবন? দেশের স্বাধীনতার পাশে খুব কি মহামূল্য এই জীবন ক'টা?

সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ থেকে সার্দূল সিং সরে আসে না। তার কাছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে স্বাধীনতা, দেশের মুক্তি অনেক বেশি মূল্যবান। সার্দূলের এই অনমনীয় মনোভাবে অন্য জাহাজীরা বিস্মিত হয়ে যায়, অনেকে ক্ষুব্ধও হয়। অন্য জাহাজীরা এটাকে গোয়ার্তুমি, সমস্যাকে জিইয়ে রাখা, অপরিণত চিন্তা বলে তাকে তিরস্কার করে। মগনলাল তাকে জানায় যে সার্দূল সিং-এর মাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আলোচনায় না বসলে তার মাকে হত্যা করা হবে। তবুও সে তার অস্ত্র ত্যাগ করতে চায় না। কারণ তার কাছে দেশের মূল্য সমস্ত সম্পর্কের চেয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।—

মগন।। কিন্তু একটা জিনিস শুনেছ? আমাদের বাবা আর তোমার মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হস্টেজ হিসাবে। অর্থাৎ আলোচনায় না বসলে, যুদ্ধে মাতলে ওদের গুলি করে মারবে। এবার কি বলবে সার্দূল?

সার্দূল।। যা বললাম তাই। মা-বাবা বুঝি না। অস্ত্র ছাড়বো না, লড়াই থামবে না।

রাজ।। সার্দূল! এদিকে এস। কী করছো? তুমি উন্মাদ।...

সার্দূল।। না। তাঁকে বাঁচানোর চেয়েও বড় হোলো লড়াইটাকে বাঁচানো। ভারতের সংগ্রামী মানুষ যেন এ কথা বলতে না পারে জাহাজীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতার লড়াইকে বিসর্জন দিয়েছিল। [৩২]

সার্দূল সিং-এর অদম্য জেদ ও অস্ত্র পরিত্যাগ না করার সংকল্পকে দমিত না করতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা এক ধূর্ত কৌশলের আশ্রয় নেয়। নৌসেনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল এবং নৌসেনাদের কংগ্রেসের তরফ থেকে গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয়েছিল তাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না। কিন্তু সেই গ্যারান্টি রক্ষা তো দূরর কথা, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল—

রাজ।। র‍্যাটট্রের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যাবো। ওঁরই বাংলোয়। তবে গ্যারান্টি চাই আমাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

মগন।। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্যারান্টি।

রাজ।। সাকসেনাজী গ্যারান্টি দিন।

সাক।। কংগ্রেস নিজে দিচ্ছে, সেখানে—

রাজ।। কংগ্রেসের চেয়ে আপনি আমাদের ঢের বেশী কাছের লোক।

সাকসেনা।। বেশ, গ্যারান্টি দিচ্ছি— আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না। [৩৩]

সর্দার মগনলাল (ইতিহাসের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল) মহেশ সাকসেনা (ইতিহাসে স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি এস. এস. খান) এবং ব্রিটিশ কমান্ডিং অফিসার র‍্যাটট্রেরা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হাত মিলিয়ে নৌসেনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের দেশ স্বাধীনতার সংকল্পকে বানচাল করে দিয়েছিল। র‍্যাটট্রের বাংলোয় যখন আলোচনার জন্য খাইবারের নাবিকরা উপস্থিত হয় তখন তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সশস্ত্র ব্রিটিশ ফৌজ তাদের ঘিরে ফেলে, গ্রেফতার করে ও জেলে পাঠায়। সব গ্যারান্টি নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই গ্যারান্টি এক মিথ্যা, আপসকামী ধর্মঘটি নেতৃবৃন্দের গ্যারান্টি ছিল অন্তঃসারশূন্য। আসলে সশস্ত্র নৌবিদ্রোহকে দমন করার উদ্দেশ্যে এইসব গ্যারান্টি ছিল এক একটা ধূর্ত কৌশল মাত্র। শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ সিদ্ধির এক কৌশল। নাটকটি ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক আন্দোলন নিয়ে শুরু হলেও তা ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। সার্দূল সিং-এর নেতৃত্বে জাহাজের নাবিকদের সব দাবি এসে সংহত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার সংকল্পে। সেই স্বাধীনতা সংকল্প ধুলোয় লুণ্ঠিত

হয় এক স্বার্থপর শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকতায়। উৎপল দত্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে অহিংস আন্দোলনের অসারতা ও সহিংস আন্দোলনের স্বার্থকতা তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। অহিংস আন্দোলনকারী কংগ্রেসিদের হীন চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে সেদিন সহিংস আন্দোলনকারী নাবিকদের সব আন্দোলনকে ভেস্তে দিযে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, ইতিহাসের সেই কালো যবনিকা তিনি 'কল্লোল' নাটকে অতি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

অজেয় ভিয়েতনাম

প্রথম অভিনয় : ৩১ আগস্ট ১৯৬৬, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, আগস্ট ১৯৬৬।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীন শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মানুষের যে 'রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, ভিয়েতনামের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস আক্রমণ ও ভিয়েতনামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন, তা সারা বিশ্বের রাজনীতিকে তোলপাড় করে তুলেছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানাচ্ছিল, ভিয়েতনামী জনগণের দুঃসাহসিক প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সমর্থন জানাচ্ছিল পৃথিবীর বিবেকবাণ মানুষেরা। এই রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে উৎপল দত্তের লেখনীও থেমে থাকেনি, তিনি এগিয়ে এলেন তাঁর নাটক নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের শরিক হিসেবে। তাঁর নাটকের মধ্যেই তিনি এই জঘন্য রাজনীতির প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তুললেন।

হ্যানয় থেকে প্রকাশিত 'ভিয়েৎনাম কুরিয়ার' পত্রিকার একটি রিপোর্টকে অবলম্বন করে এই নাটকটি লেখা হয়েছিল। আক্রান্ত ভিয়েতনামী গ্রামবাসীদের ওপরে মার্কিন সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের খতিয়ান নিয়েই এই নাটক। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ক্লার্ক সাহেব মিনার্ভায় যখন 'অজেয় ভিয়েতনাম' অভিনীত হচ্ছিল তখন এই নাটক দেখতে আসেন। নাটক দেখে তিনি উৎপল দত্তের উদ্দেশ্যে বলেন যে— তারা এসব মিথ্যা প্রচার করছেন, মার্কিন সেনারা এই নৃশংস অত্যাচার কখনই করতে পারে না। জবাবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *"আমরা হ্যানয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ নাটক করেছি, আর আপনারা মার্কিনরা হচ্ছেন দুনিয়ার পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী।* [৩৪]

'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে বীভৎসতার ওপরে। ভিয়েতনামের মানুষের ওপরে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে মার্কিন সেনাবাহিনীর অত্যাচারই এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। সেই

সঙ্গে ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র প্রতিবাদ প্রতিরোধকেও দেখানো হয়েছে। বাংলা নাটকে এরকম ভয়ংকর ও বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য খুবই কম দেখা যায়। দুটি যুযুধান পক্ষ— একদল লড়ছে দেশের জন্য, আক্রান্ত মাতৃভূমির জন্য নারী শিশু ও দেশকে বাঁচানোর জন্য। আরেক দল হল আক্রমণকারী, তারা লড়ছে অন্যদেশের বুকে বসে তাদের সবকিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য। সৈন্যদের এই মানসিক ফারাক অতি সুন্দরভাবে নাটকটির মধ্যে উৎপল দত্ত সুচিত্রিত করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে বাংলার রাজ্য ও রাজ্যনীতিতে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল আলোচ্য নাটকটি।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই মার্কিনী অফিসারদের তৎপরতা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কুচি নামক শহরে মার্কিন জেনারেলের দফতরে জেনারেল কিট্‌স কোল্টন একটা ফাইল খুলে খুব দ্রুত লেখালেখি করতে থাকেন, পিছনের জানালাগুলো বালির বস্তা দিয়ে ঠাসা। বালির বস্তা দিয়ে ভিয়েতনামীদের তীব্র প্রতিঘাত ও প্রতিরোধকে ঠেকাতে চাইছেন। এই দৃশ্যেই তার কথা থেকেই জানা যায় সায়গন থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে এই কুচি শহর, সেখানে হেলিকপ্টারে চড়ে আসতেই সময় লাগছে নয় ঘণ্টা। ভিয়েতনামীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সামনে পড়ে তাদের ঘুর পথে আসতে হচ্ছে। উৎপল দত্ত এখানে ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের বীরত্ব ও গৌরবের জয়গান করেছেন—

> *জেনারেল : আপনারা অত্যন্ত ক্লান্ত আমি জানি। রাত বারোটায় সায়গন থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে এই কু-চি শহরে আসতে ন'ঘণ্টা সময় লেগেছে। কেন এত ঘুরে আসতে হয় সবাই জানেন।*
>
> *ফিনি : হলদে শয়তানরা রাইফেল দিয়ে হেলিকপ্টার নামাবে নইলে—।* [৩৫]

চারজন সামরিক অফিসার জেনারেলের ঘরে ঢোকেন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের হো-বো গ্রামে অপারেশন কীভাবে শুরু হবে, তাই নিয়ে আলোচনায় বসেন।

এই চারজন অফিসারদের মধ্যে মার্ক হুইলার, যিনি ভিয়েতনামে নতুন এসেছেন, তিনি হো-বো গ্রামে সমস্ত অপারেশানের নেতৃত্ব দেবেন এবং অপারেশনের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশান ক্রিমপ্‌।'[৩৬] জেনারেল তাকে ভিয়েতনামের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেন। জেনারেলের নির্দেশে একটি চার্ট আসে, সেখানে লেখা থাকে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধে মার্কিনদের যে ক্ষয়ক্ষতি তার হিসাব নিকেশ দেখিয়ে দেয় জেনারেল। —

> *জেনারেল ।। ফর দি ইনফর্মেশন অব দিস ভেরি আমেরিকান ইয়ংম্যান— পাঁচ বছরে ওরা এক লক্ষ*

তেইশ বার আমাদের আক্রমণ ক'রে চার লক্ষ ষোলো হাজার লোককে মেরে গেছে। সত্তর হাজার সাতশ উনসত্তরটি অস্ত্র নিয়ে গেছে কেড়ে। [৩৭]

এরপরে আমরা আর একটি চার্ট দেখতে পাই সেখানে ভিয়েতনামী বন্দিদের কীভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে তার একটা বিস্তারিত নির্দেশনামা। আমেরিকান সেনা অফিসাররা ভিয়েতনামী বন্দিদের উপরে বীভৎস শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত, উৎপল দত্ত সেই অত্যাচারের দৃশ্য নাটকের ভাষায় অতীব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যা পড়ে ও দেখে পাঠকবর্গ বীভৎসতার আতঙ্কে শিহরিত হয়। মার্কিন সেনা অফিসাররা ভালো মতোই জানেন যে ভিয়েতনামী মুক্তিযুদ্ধের মানুষরা অর্থাৎ গেরিলারা গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য পায় বলেই তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। অতএব গ্রামবাসীদের জেরা করে বার করতে হবে গেরিলারা কোথায় লুকিয়ে আছে। স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্যন্ত অত্যাচারের বীভৎসতা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। তাদের চার্টের নির্দেশনামা এইরকমই—

প্রথম— ছুরি, একটু একটু ক'রে ঢুকিয়ে। দ্বিতীয়— কাঁটাতারের ফাঁস, গলায় পরিয়ে চাপ। তৃতীয়— বন্দুকের কুঁদো দিয়ে হাতের আঙুল ছেঁচে দেয়া। চতুর্থ—

ফিনি।। কোনো লাভ হয় না, স্যার, বিয়েন হোয়াতে আমরা সঙীন গরম ক'রে সারা গায়ে ছেঁকা দিয়েছি, তবু কেউ কিছু বলেনি।

জেনারেল।। বলার ওপর অত জোর দিচ্ছেন কেন, কর্ণেল, আমরা তো জানি বলবে না। তবু যন্ত্রণা দিতে হবে। টর্চার থেকে গবেষণার আনন্দ যদি না পান, হলদে উলঙ্গ দেহগুলোকে ছটফট করতে দেখে যদি একটা বৈজ্ঞানিক শিহরণ না জাগে শিরদাঁড়ায়, তবে বুঝবেন ভিয়েতনামে লড়বার মতন স্নায়ু তৈরী করা হয়নি এখনো— এক্ষুনি বদলির আবেদন করুন। চতুর্থ— চোখের সামনে ফ্লেমথ্রোয়ারের ফিউম ছেড়ে চোখ গলিয়ে দেয়া। পঞ্চম থেকে একাদশ— মনস্তাত্ত্বিক চাপসৃষ্টি, যথা মায়ের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, বা অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে আত্মীয়কে নির্যাতন।

নাইট।। প্লেই মে-তে একটা মেয়েকে স্বামীর সামনে ধর্ষণ করিয়েছিলাম।

জেনারেল।। মোস্ট সায়েন্টিফিক। দ্বাদশ বিষয়টি লক্ষ্য করুন— মার্কিন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স্-এর আবিষ্কার— ইলেকট্রিক শক। এই ব্যাটারী আপনাদের কিট্-এর সঙ্গে দেয়া হবে। মেড বাই স্টক্টন ইলেকট্রিক্যাল্স্, নিউ ইয়র্ক।

ঐ তার দুটো বেঁধে দিতে হবে— চার্ট দেখুন— মেয়েদের স্তনে আর পুরুষদের জননেন্দ্রিয়ে। মন্তব্য— আগে এক বালতি জল ঢেলে নেয়া প্রয়োজন সাবজেক্ট-এর গায়ে। [৩৮]

এরপর যে চার্টটি আসে সেটি যুদ্ধে গ্যাস বোমা ব্যবহার বিষয়ক। মার্কিনী তথ্য অনুসারে এই গ্যাস বোমা ব্যবহার করে তারা ভিয়েতনামে প্রায় চার লক্ষ লোককে পঙ্গু করে দিতে সমর্থক হয়েছেন। গ্যাস দুটির নাম-ক্লোরোঅ্যাসেটোফেনোন ও ফেনারসাক্সি ক্লোরাইড। যে দুটি সংক্ষিপ্ত নাম— সি-এন ও ডি-এম। এই গ্যাসে ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায় সেই সঙ্গে শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি করে মারা যায়। ফসল নষ্ট করতে পারলে ভিয়েতনামীরা অন্নাভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে আবার শিশুদেরকে হত্যা করতে পারলে তাদেরকে মানসিকভাবেও দুর্বল করে দেওয়া যাবে। সঙ্গে গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার প্রচুর লোকের প্রাণহানিও হবে। আসলে মার্কিনীরা ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের উপরে বীভৎস অত্যাচার করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়াই ছিল যেন তাদের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের এই কুৎসিত অত্যাচারী লোভ দেখে সমস্ত পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। জেনারেল কিট্‌স কোল্টন-এর সংলাপে সেই অত্যাচারের বীভৎসতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি—

> *গেরিলাদের সঙ্গে লড়বেন, অথচ নির্বিচার হত্যা করতে দ্বিধা করবেন। এভাবে হবে না। জেন্টল্‌মেন, মার্কিন সরকারের নির্দেশ— কিল অল, বার্ণ অল, ডেস্ট্রয় অল। আমরা জানি এ যুদ্ধ জিততে পারবো না। কিন্তু এশিয়ার বুকে এমন দাগ রেখে যেতে হবে— এমন বীভৎস একটা ক্ষত রেখে যেতে হবে, যে দুনিয়ার শত্রু চীনা কমিউনিস্টরা... (জেনারেলের বিকারগ্রস্ত মুখের মাংসপেশী কাঁপছে, মুখ থেকে ফেনা ঝরতে শুরু করে) ইন্দোনেশিয়ায় যেমন কমিউনিস্টদের বাচ্চাগুলোকে তলোয়ারে গেঁথে... কাউকে রেহাই দেবেন না... মেয়েগুলোকে ধরে, স্তন ছিঁড়ে... দেশটার নাড়িভুঁড়ি বার করে দিন...* ৩৯

ভিয়েতনামীদের উপরে মার্কিনী সেনা অফিসারদের অত্যাচারের যে নির্দেশনামা তার বাস্তবায়ন ঘটে তৃতীয় দৃশ্যে। এই দৃশ্যে মার্কিনী সেনাবাহিনী এসে হাজির হয় হো-বো গ্রামে, নেতৃত্বে ছিলেন হুইলার। এ দৃশ্যটি পুরোটাই অত্যাচারের দৃশ্য। মার্কিন সেনাদের দ্বারা ভিয়েতনামী নারীদের ধর্ষণ, নারীদের সার্চ করার নামে তাদের উলঙ্গ করিয়ে প্যারেড করানো, ভিয়েতনামী যোদ্ধাদের একটু একটু করে ছুরি ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, ক্লেমথ্রোয়ার-এর ফিউম চড়িয়ে তাদের চোখ গলিয়ে দেওয়া, নারীর স্তনে ইলেকট্রিক শক দেওয়া— এসব সবই চলতে থাকে একের পর এক। অত্যাচারের কোনো কিছুই বাদ যায় না। ধর্ষণ ও অত্যাচারের এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত সুকৌশলে দর্শকদের কাছে রাজনৈতিক বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। কর্ণেল হুইলার যখন ভিয়েতনামী নার্স মাও-কে ধর্ষণ করেন তখন ড: ভিন হুইলারকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

এই মেয়েটিকে যে জোর করে ভোগ করলেন সে বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, অসভ্য এশিয়ার মেয়ে বরং আমেরিকার স্পর্শে এসে সভ্যতা শিখলো, আকছার শিখছে পুরো ভিয়েতনাম জুড়ে। [৪০]

উক্তিটির মধ্য দিয়ে ধর্ষণ দৃশ্যের বীভৎসতা দর্শকদের মনকে ভেদ করে তাদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে আমেরিকানদের দুরাচারিতা, বর্বরতা। দর্শকের মনের মধ্যে এক রাজনৈতিক চিন্তা উঁকি দিয়ে ওঠে। আবার ভিয়েতনামী নারীদের উলঙ্গ করে প্যারেড করানোর সময় মার্কিন ফৌজের হিংস্র কামাতুর শ্বাপদ সুলভ উল্লাস দেখে ড: ভিন চিৎকার করে ওঠেন—

সভ্যতা— সভ্যতা শেখাচ্ছে সভ্যতা সভ্যতা— সভ্যতা— [৪১]

এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে পাশবিকতার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। আমেরিকানদের প্রতি একটা ঘৃণা তিনি দর্শকদের মনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

মার্কিনী সেনাবাহিনীর নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচারের পরও ভিয়েতনামীদের আপসহীন সংগ্রাম, দেশ রক্ষার জন্য জীবনকে বাজি রেখে তাদের লড়াই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। শত অত্যাচারেও তাদেরকে অবদমিত করা যায়নি। তারা তাদের পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষার লড়াইয়ে অবিচল থেকেছে ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের গেরিলা 'কাস্ত্রোব্যাটেলিয়ান'-এর নেতা ছদ্মবেশী ত্রাক-এর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত তারা জয় লাভ করে। নাটকের শেষ অংশে দেখা যায় মার্কিনী সেনাদের অত্যাচারের মধ্যেই মাদাম লান হু এসে উপস্থিত হন। ইনিই আসলে ত্রাক।—

হুইলার।। (হেসে) আসুন মাদাম হু! ত্রাককে এনেছেন তো সঙ্গে?

হু।। হ্যাঁ, এনেছি। আমিই ত্রাক! (টমি গান তুলে ধরেন) হাত মাথার ওপরে! প্রত্যেকে! [৪২]

আমেরিকানদের এই অপ্রত্যাশিত চমকের ঘোর কাটতে না কাটতে দেখা যায় 'কাস্ত্রোব্যাটেলিয়ান'-এর গেরিলারা চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে মার্কিন অত্যাচারী হানাদারদের, বেতার সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে, সেনাদের অস্ত্র দখল করে নিয়েছে ও তাদের বন্দি করেছে। গেরিলা বাহিনীর অপ্রত্যাশিত ও সাংঘাতিক আক্রমণে হো-বো এলাকার যুদ্ধে আড়াই হাজার মার্কিন সেনার মধ্যে দু'হাজার হতাহত বা বন্দি হয়েছে।

ভিয়েতনামীদের উপরে মার্কিনীদের এই অত্যাচার পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষেরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে থেকেছিল। বিবেকবান মানুষ

হিসেবে উৎপল দত্তের প্রতিবাদের ভাষা প্রতিভাসিত হয় আলোচ্য নাটক 'অজেয় ভিয়েতনাম'-এর মধ্য দিয়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাশে অন্য কিছু ধনতান্ত্রিক দেশের সমর্থন থাকলেও, দুনিয়ার সিংহভাগ মুক্তিকামী মানুষ সে সময় ভিয়েতনামের জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষ ও সাধারণ জনগণও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে স্লোগান তুলেছিল—

আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম- ভিয়েতনাম'। [৪৩]

সেদিন ভিয়েতনামী গেরিলা সৈন্যদের পাশাপাশি ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই মিলে ইয়াঙ্কি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ে নেমেছিল, তা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে।

তীর

প্রথম অভিনয় : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আগস্ট ১৯৯৫।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলার রাজনীতির ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উৎপল দত্তের 'তীর' নাটকটি। উৎপল দত্ত একসময় নিজেকে অতি বাম রাজনীতির মধ্যে নিজেকে ক্রমে জড়িয়ে ফেলেন। অতিবাম রাজনৈতিক চিন্তা সেই মুহূর্তে মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সঠিক পন্থা বলে তিনি মনে করতে থাকেন। এই অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা থেকেই 'তীর' নাটকের সৃষ্টি।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট 'যুক্তফ্রন্ট' পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। বেনামি জমি উদ্ধার, খাস জমি বন্টন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কৃষক খেতমজুরদের সঙ্গে প্রশাসনের, পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে, এতে অনেক আদিবাসী রমণী ও শিশু নিহত হয়। এই রাজনৈতিক ঘটনাবৃত্তান্ত, যা সারা পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, আর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উৎপল দত্ত সৃষ্টি করলেন 'তীর' নাটকটি। বিপ্লবী নেতা চারু মজুমদারের মতাদর্শ, জীবন দর্শন, সশস্ত্র বিপ্লববাদ 'তীর' নাটকের নাট্যবিষয় ও কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে উঠল। 'তীর' নাটক সম্বন্ধে উৎপল দত্ত 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—

মনে করেছিলাম প্রসাদুজ্যোতে পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে। যেই সরকারে থাকুক না কেন! আরো ভেবেছিলাম কৃষক যোদ্ধার বীরত্ব অমর গাথা হয়ে থাকবে, পথটা যদি ভুলও হয় তবুও থাকবে। [৪৪]

'তীর' নাটকের তথ্য সংগ্রার্থে উৎপল দত্ত ও তার সহযোগী তাপস সেন, নির্মল গুহরায় নকশাল বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে পনেরো দিন ছিলেন। তারা নকশাল নেতা চারু মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তার রাজনীতির দ্বারা উজ্জীবিত হন। সেখানকার গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওরাওঁ, রাজবংশী, গোর্খা, বাঙালি মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রামী কৃষকদের মুখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক লিখলেন ও তার মহলা শুরু করলেন। 'তীর' নাটকের তথ্যসংগ্রহের প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

নাটকের মালমশলা সংগ্রহার্থে তাপস, নির্মল গুহরায় ও আমি যাই শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, প্রসাদুজ্যোত আলিপুরদুয়ার। ... চারু মজুমদার, সৌরীন বসু এবং তিলক রায়ের কাছে থেকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই, কৃষক-কমরেডদের গান রেকর্ড করি, গুলিচালনার দিনকার অভিজ্ঞতা শুনি অনেকের মুখে। [৪৫]

আমরা এখন 'তীর' নাটকের রাজনৈতিক কার্যাবলি, রাজনৈতিক হত্যা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক বক্তব্যগুলির উপরে আলোকপাত করব। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখনও গঠিত হয়নি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নকশাল বাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, নেতাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনছেন কৃষকরা। এখানকার কৃষক ও মজদুররা দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যে কমিউনিস্ট নেতা শিবেন রায় কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, তিনি ১৯৬২-এর ভারত চীন যুদ্ধের সময় এই কৃষকদেরই একজনের ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। কৃষকদের মধ্যে আছে রাজবংশী, সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালী ও বাঙালি জনজাতির মানুষ। আর একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা দেবী দাস, তাঁকেও দেখা যায় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে ও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। দেবী দাস সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। মারের বদলে মার, অস্ত্রের বদলে পালটা অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী। জোরদার সত্যবান সিং-এর ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনীর হাতে তার প্রিয় কমরেড দুখুরু-র মৃত্যু সংবাদে সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে—

দেবী।। আর বাবুগিলা বসি বসি কি করিবার ধচ্চেন করে? অস্ত্রগুলো কি শুধু মাথার ওপরে নাচাবার জন্য? স্লোগানের সঙ্গে তাল ঠোকার জন্যে? [৪৬]

শিবেন রায়ের মতামত একটু ভিন্ন। তিনি সুকৌশলে লড়াই করে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী ও অস্ত্র ধারণের পক্ষপাতী হলেও তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তার মতামত হল—

শিবেন।। আমরা জিতব। সরকারের মধ্যে পর্যন্ত আমরা থাকব। তখন? তখন আপনাদের সামনে নূতন পথ খুলে যাবে না? এখন ধান কাড়তে গেলে পুলিশ আসে; তখন আমরা থাকবো মন্ত্রীসভার মধ্যে, পুলিশকে আসতেই দেব না। আর পুলিশের সাহায্য না পেলে, ঐ সত্যবান সিংরা একদিনও টিঁকতে পারবে? ... তখন শুরু হবে আরো বড় লড়াই। ধানের লড়াই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনে রাখবেন, জনতা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল না করলে ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত রাইফেল হাতে নিয়েই ফয়সালা করতে হবে— এটা যেন ভুলবেন না! মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তি ফৌজ গড়তে হবে। সেটাই চীনের পথ— চেয়ারম্যান মাও-ৎসে-তুং-এর শিক্ষা।

শিবেন।। মনে রাখবেন সবাই আমরা আপনাদের হাতে একটা অস্ত্র, শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। [৪৭]

আন্দোলনের পন্থা অথবা জোরদারের হাতিয়ার গুণ্ডাদের হাতে, কৃষকরা খুন হচ্ছে, জোরদারের বাহিনীরা ধান লুঠ করছে, এইসব সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় দেবী দাস ও শিবেন রায় দুই মার্কসবাদী নেতার বক্তব্য বা মতামতে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আসলে এই সময়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি অংশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের অদম্য ঝোঁক, অতি বাম পন্থা। উৎপল দত্ত এই সত্যকে সুকৌশলে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবী দাস অস্ত্রের উপাসক; অপরপক্ষে শিবেন রায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। অথচ দুজনেই একই পার্টির সদস্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় জোরদার সত্যবান সিং-এর গৃহের প্রাঙ্গন। সেখানে কৃষক মজুররা তাদের মজুরি নিতে এসেছে। কিন্তু জোরদারের লোকেরা মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে তাদের প্রাপ্য মজুরির বহু অংশ যেমন মেরে দিচ্ছে তেমনি তাদের প্রাপ্য ধান তারা আত্মসাৎ করছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান দেনার দায়ে কৃষক মজদুরদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে অন্যায়ভাবে। জোরদারের লোকেদের অন্যায় হিসেব যখন চরমে ওঠে তখন আর সহ্য করতে না পেরে কৃষকদের মধ্যে বির্সা ওরাওঁ প্রতিবাদ করে বলে ওঠে—

বির্সা।। আমাদের হাতে আজ তীরধনুক নেই বলেই, একটা অসহায় মেয়েকে জমি থেকে— ...

.....

বির্সা।। আমরা বোকা, তাই আপনাদের তীর চালিয়ে না মেরে; ভোট দিচ্ছি। [৪৮]

এখান থেকেই আমরা লক্ষ করি জোরদার জমিদার ও শাসক শ্রেণির কৃষকদের নির্মম শোষনের চিত্র ও বলগাহীন ষড়যন্ত্রের এক নগ্নরূপ। যেনতেন প্রকারেণ শ্রমিক কৃষকদের শোষণ করাই এই জোরদার শ্রেণির একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার বির্সা ওরাওঁ তার মন্তব্যের মধ্য দিয়েও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের আগে যে অতি বাম মানসিকতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দানা বাঁধছিল সেই তথ্যও উন্মোচিত হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে জবাব— এই অতি বাম মানসিকতা উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় দৃশ্যে। বলাবাহুল্য তিনিও এই সময় এই অতি বাম মানসিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

জমিদারি অত্যাচার শোষণ শাসনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় 'বিরহ' নামক তৃতীয় দৃশ্যে। সেখানে দেখা যায় গ্রামের কৃষক বৈশাগুর মেয়ে দেবারীর সঙ্গে আর এক কৃষক কেরকেটুর ছেলে জোনাকুর বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেখানে সবাই যখন বিয়ের আনন্দ উৎসবে মত্ত সেসময় জোদ্দার সত্যবান সিং সপারিষদ হাজির হন সেখানে। বিয়ের আনন্দ উৎসবের মধ্যে সত্যবান সিং কেরকেটুর প্রতি নির্মম আঘাত হেনে বলেন, কেরকেটুর যে জমির মামলাটা ছিল সেটা হেরে গেছে। আদালত রায় দিয়েছে, ও জমি আসলে সত্যবানের ছেলে জীমূতের। সত্যবান সিং সেই সঙ্গে আরও বলেন—

> *সত্যবান।। ... অর্থাৎ ৫৯ সালে জমিটা বে-আইনী দখল করেছিল কেরকেটু কাকা। সেই বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছরের ত্রিশ মণ করে ধান আমার পাওনা হোলো। সাত বছরে সেটা দাঁড়াচ্ছে দুশ'দশ মণ ধান। অথবা টাকার অংকে সরকারি দরে, মণ প্রতি বাইশ টাকা হিসেবে চার হাজার ছ'শ কুড়ি টাকা।...*
>
> *তা ছাড়া ঐ ঘরটার ভাড়া ধরা হয়েছে মাসে দুটাকা হিসেবে প্রতি বছর চব্বিশ টাকা। সুতরাং সাত বছরে একশ আটষটি টাকা।* [৪৯]

সত্যবান সিং মামলার বিষয়ে আরো জানান—

> *সত্যবান ।। এর সঙ্গে মামলার খরচ যোগ হবে, বুঝলে কেরকেটু কাকা? আমার ব্যারিস্টারের ফী, স্ট্যাম্প, এফিডেভিট ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক হাজার ন'শ চৌত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা। সব যোগ করলে দাঁড়ায় ন হাজার ছ'শ তিরানব্বই টাকা, পঞ্চাশ পয়সা।* [৫০]

এই বিশাল ঋণের কথা শুনে কেরকেটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। সত্যবান সিং যাওয়ার সময় এটাও জানিয়ে যান আইন অনুযায়ী ঋণ মৃত্যুর পরেও চলে তাই তিনি ঋণ শোধ না করতে পারলে তার ছেলে জোনাকুর উপরে এই ঋণের বোঝা বর্তাবে। এখানে উৎপল দত্ত

জমিদার জোতদারদের ভয়াবহ শোষণ, যেকোনো প্রকারে সম্পত্তি হরণ ও কৃষকদের সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক্ষমতালোভী ক্ষমতার অলিন্দে থেকে অভ্যস্ত সত্যবান সিং আসন্ন নির্বাচনের আঁচ বুঝেই কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেয় এবং নির্বাচনে দাঁড়ায়। 'যুক্ত ফ্রন্ট' নামক দৃশ্যে দেখা যায় জোরদার সত্যবান সিং ভোটে জয়লাভ করেছেন, কমিউনিস্ট প্রার্থী শিবেন রায়ও জিতেছেন এবং মন্ত্রী হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবে তার সঙ্গে জোরদার সত্যবান সিং-এর পার্টি বাংলা কংগ্রেসও থাকবে। কমিউনিস্টরা জিতেছে শুনে কৃষকরা উল্লসিত হয়ে পড়ে—

> *উপাসু।। কংগ্রেসের তিরপাতিরপি শেষ! ঢিপির পেট কংগ্রেসিরা পলায়ন করিতেছে। কংগ্রেস হেরে ভূত। শিবেনদা মন্ত্রী হয়েছেন। [উল্লাসে ফেটে পড়ে গ্রাম; রাস্তার ওপর নাচ শুরু হয়ে যায়। অত্নেশ্বরীকে ধরে নিয়ে রাস্তায় ওঠেন কেরকেট্টু।]*
>
> *অত্নেশ্বরী।। শিবেন মন্ত্রী হয়েছে!*
>
> *গজুয়া।। হ্যাঁ, ভেতর থেকে লড়বে শিবেন, বাইরে আমরা। মনে আছে— বলে গিয়েছিল?*
>
> *গোব্রিয়েল।। এবার তাহলে বিপ্লব শুরু! শিবেন দা বলে গিয়েছিল!*
>
> *বির্সা।। শালা সত্যবান সিং-এর গুদাম ভেঙে চাল বার ক'রে নেব এবার!* [৫১]

কিন্তু কৃষকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যখন তারা দেখে যে তাদের নেতা শিবেন রায় জোরদার সত্যবান সিং-এর সঙ্গে কোলাকুলি করছেন, দুজনে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি উঠছেন রিপোটারদের সামনে। কৃষক মজদুররা আরো অবাক হয়ে যায় যখন তারা শোনে তাদের নেতা শিবেন রায় বলছেন—

> *শিবেন।। ... সে খাদ্যনীতির মূল কথাটা হোলো— মজুতদার-জোতদার-অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এখুনি আমরা কোনো বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমরা তাঁদের কাছে আবেদন রাখছি— যে লক্ষ লক্ষ টন চাল আপনারা মজুত করেছেন, বাংলার মানুষের, বাংলার শিশুদের শুষ্ক, ক্ষুধার্ত মুখ চেয়ে, সে চাল আপনারা বাজারে ছেড়ে দিন। আমরা বিশ্বাস করি, মজুতদার-জোতদাররাও মানুষ। তাঁদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।* [৫২]

অথচ এই শিবেন রায় ভোটের আগে অত্নেশ্বরীকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন যে সত্যবান সিং-কে গাছে বেঁধে চাবুক মারবে, তার চোখ অন্ধ করে দেবে। আবার দেখা যায় বক্তৃতার শেষে শিবেন রায় তার বিশ্বস্ত কমরেড দেবী দাসকে নিভৃতে বলে যান, তিনি যা বলেছেন শুধু কৌশল হিসেবে। তিনি আরও বলেন—

শিবেন।। তাহলে আমরা মন্ত্রীসভায় ঢুকেছি কি করতে? পুলিশ আসবে না। এতক্ষণ শুনলেন না? [৫৩]

পরের দৃশ্যে দেখা যায় বিপ্লবী কৃষক নেতা দেবী দাসের নেতৃত্বে কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে। তারা মাও-ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে থাকে। দেবী দাসের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হতে থাকে বিভিন্ন এলাকায়, তারা অস্ত্র শিক্ষা করতে থাকে ও অস্ত্র বিদ্যায় ক্রমশ পারদর্শী হতে থাকে। জনযুদ্ধের যে দশটি নীতি, সেই দশটি নীতি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে থাকে ও দশটি নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। তাদের জননেতা শিবেন রায় যেহেতু কথা দিয়ে গেছে যে পুলিশ আসবে না তাই কৃষক শ্রেণি জোটবদ্ধ হয় ও সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়। জোরদার সত্যবান সিং-এর বাড়ি আক্রমণ করে সব মজুত করা চাল ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবী পরিষদে জমা করে সত্যবান সিংকে বাড়ি ছাড়া করার জন্য। কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এরপর 'বিদ্রোহ' নামক দৃশ্যে আমরা দেখি কৃষকরা দলবদ্ধভাবে পরিকল্পনা মাফিক সত্যবান সিং-এর বাড়ি আক্রমণ করেন। চতুর্দিকে মাদল ও নাগড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে আকাশ-বাতাস কাঁপানো চাষি মজুরদের হুংকার—

চাষী মজুর এক হও! আপন হাতে রাজ নাও! [৫৪]

কৃষকদের পরিকল্পনামাফিক আক্রমণে সত্যবান সিং-এর লোকজন দিশেহারা হয়ে পড়ে ও সত্যবান সিং প্রাণে বাঁচতে পলায়ন করেন। কৃষকরা সত্যবান সিং-এর মজুত করা গোলাভরা চাল সব লুঠ করে ও তাদের বিপ্লবী পরিষদে জমা করে। কৃষকদের অন্নের জন্য যে তীব্র হাহাকার ও আকুল ক্রন্দন তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঝিমোশ্বরী এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে সত্যবান সিং-এর রক্ষিতা হয়ে থেকে বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে থেকেও শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবে সেও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে সেও এগিয়ে আসে। কৃষকের সশস্ত্র হামলার সময় যখন সত্যবান সিং দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং তার কাছ থেকে যখন বন্দুকটা পড়ে যায় ঝিমোশ্বরী সত্যবানের বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলে। আবার ঝিমোশ্বরী রবিরামের গা ঘেষে দাঁড়ায়। হুলুস্থুল কাণ্ডের মধ্য বন্দুকটা তার লক্ষ্য। শেষে দেখা যায় ঝিমোশ্বরী লুকোনো বন্দুকগুলো বার করে দেয় তাদের নেতা দেবী দাসের সামনে। তারপর সকলের মুখের দিকে তাকায় প্রশংসা ও অনুমোদনের আশায়। উৎপল দত্ত এখানে ঝিমোশ্বরীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে শামিল হওয়ার বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

এরপর কৃষক বিদ্রোহ একে একে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। সশস্ত্র পুলিশও বিদ্রোহ দমন করতে থাকে কঠোর হাতে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে ঘটনায় দেখা যায় গ্রামের লৌকিক পূজা উপলক্ষ্যে নারী পুরুষরা জড়ো হয়েছিল। মেয়েদের দেখা যায় গ্রামের পথ ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। এমত অবস্থায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র কৃষক নারীদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আটজন নারী ও দুজন শিশুসহ মোট দশ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করল। এই হত্যাকাণ্ড এতটা নৃশংস ও এতটা বীভৎস ছিল সমসময়ের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর বিবেকবান মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়, উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতি। ঘটনার বীভৎসতায় ও নৃশংসতায় আঁতকে উঠেছিল আমজনতা—

> *মেয়েরা কিছু বুঝবার আগেই চারিপাশ থেকে সবগুলো রাইফেল গর্জন করে ওঠে— দেহগুলো ছিটকে ছিটকে চলে যায় এদিকে ওদিকে—। নৃশংসতম, অকারণ এ গুলিবর্ষণ : মৃতদেহের ওপরও চলে গুলিবর্ষণ কিছুক্ষণ। তারপর সব থামে। সব দেহ স্থির, শুধু সোমারি, একবার পিঠের বাচ্চাটাকে ধরার চেষ্টা করে, উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আর দেবারী বুকে হেঁটে গিয়ে একটা তীর, তারপর একটা ধনুক টানতে চেষ্টা করে কাশবন থেকে। তারপর স্থির হয়ে যায়।* [৫৫]

নির্বিচারে ও নির্মমভাবে কৃষক রমণীদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল। বারোতম দৃশ্যে আমরা দেখি এই নির্মম হত্যার প্রতিশোধ নিতে কৃষকরা রাস্তার উপরে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁশের মাচা তৈরি করে। পুলিশের গাড়ি যখন সেই মাচার উপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাদের বিশেষ সংকেত ও কৌশলের মাধ্যমে তারা গাড়িটিকে উল্টে ফেলতে সক্ষম হয় ও আরোহী পুলিশ কর্মীদের উপরে বন্দুক ও তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা ও পলায়নে বাধ্য করে।

পুলিশের আক্রমণ ও কৃষকদের প্রতিবাদ ও প্রত্যাক্রমণের মধ্য দিয়ে নাটক এগোতে থাকে। পুলিশের বন্দুকের জবাব তারা তীর ধনুক দিয়েই দিতে থাকে। অজানা উৎস থেকে ছুটে আসা তীরের সামনে পুলিশ বাহিনী বিধ্বস্ত ও নিহত হতে থাকে রাইফেলধারীরা পলায়নে বাধ্য হয়। এরপর দেখি এই বিদ্রোহকে সমূলে উৎপাটিত করতে সরকারপক্ষ বিশেষভাবে তৎপর হয়। তারা আর পুলিশের উপর ভরসা করতে পারেন না। সরকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় EFR অর্থাৎ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স-এর বাহিনী দ্বারা এই বিদ্রোহকে দমন করতে হবে ও সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, এই বিদ্রোহকে না নিঃশেষ করতে পারলে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তা দাবানলে পরিণত হবে এবং এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তারা বিশেষ দক্ষ অফিসারকে নিয়োগ করেন। এখানে লক্ষণীয় এই বিদ্রোহ দমনের প্রস্তাব রাখেন সরকারের পক্ষ হয়ে শিবেন রায়—

শিবেন।। যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বড় রাস্তা ধরে, তাও যতক্ষণ বেলা থাকে— খানিক টহল দেয়া ছাড়া পুলিশ আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। করার মতন মনোবল নাকি ওঁদের নেই। সুতরাং এ অঞ্চলের পুলিশ ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌-এর জয়েন্ট অপারেশনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ত্রিলোক সিংকে। — এবার সরকার আশা করেন যে... নকশাল বাড়ির স্ফুলিঙ্গটা ভারতব্যাপী দাবানলে পরিণত হওয়ার আগেই নিভে যাবে। ওদের: ... ওদের শেষ করে দিন। শুট টু কিল। [৫৬]

'তীর' নাটকটি একান্তভাবে জোরদার জমিদারদের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ ছিল। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন জোরদার জমিদারের দল কীভাবে কৃষকদের ধান কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে তারা নিরন্ন মানুষদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে চাল মজুত করে চলেছে, কীভাবে দরিদ্র কৃষকদের অভুক্ত ও শোষিত করে রেখেছে। সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালি, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির মানুষ কীভাবে দিনের পর দিন চরম অন্যায়ের শিকার হয়েছে এই জমিদার জোরদারদের কাছে, কীভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, কীভাবে সুদের জালে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েছে তা উৎপল দত্ত সুকৌশলে তুলে ধরেছেন। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ উত্তরবঙ্গের জনজাতি একসময় সশস্ত্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। 'তীর' নাটকে কৃষক-শ্রমিকদের বীরত্ব এবং পুলিশ, জমিদার ও জোরদার শ্রেণির বলগাহীন সন্ত্রাসের বাস্তব রূপ অঙ্কন করলেন উৎপল দত্ত। 'তীর' নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

তীর নাটকে কোনো মিথ্যার অস্তিত্ব নেই। আমি আমার নাটকে কোনো দিনও মিথ্যা প্রচার করিনি। কৃষকদের বীরত্ব ও পুলিশের বলগাহীন নিষ্ঠুরতা ছিল বাস্তব সত্য; এটা ছিল শ্রেণী সংগ্রামের একটি মুহূর্ত, ইতিহাসের একটি আলোকিত অধ্যায়, শ্রেণী-সংঘর্ষের এক নগ্ন বিস্ফোরণ যেখানে তথাকথিত কৃষক-দরদীদের নিয়মিত আপস ও নানা মুখোশের কোনো চিহ্ন ছিল না।... আন্দোলনটার সময় ভুল ছিল কিনা, নেতৃত্ব অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছিলেন কিনা, এ সবের চেয়ে অনেক বৃহৎ সত্য ছিল জনতার বীরত্ব ও সাহস— এটাই বিপ্লবী থিয়েটারের প্রধান উপাদান। [৫৭]

উৎপল দত্তের 'তীর' নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর অতি বাম মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। একসময় উৎপল দত্তের মনে হয়েছিল, সংগ্রামই মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। উৎপল দত্ত ক্রমে ক্রমে অতি বাম রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং সেই অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তাকে সেই সময়ের মেহনতি মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের সঠিক পথ বলে মনে করতে থাকেন। তাঁর অতি বাম মানসিকতার ফসল হল এই 'তীর' নাটকটি। উত্তরবঙ্গের

কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনি প্রকাশ পেল এবং প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তা। উৎপল দত্তের সঙ্গে সি.পি.আই (এম)-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এই সময় তিনি সি.পি.আই (এম)-কে প্রবলভাবে সমালোচনা করতে শুরু করেন। 'তীর' নাটকটি প্রস্তুতির সময় উৎপল দত্ত অতি বাম রাজনীতিকেই সঠিক পন্থা মনে করেছিলেন। এই সময় তিনি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর নকশাল আন্দোলন ও নকশাল চিন্তাধারা তথা অতি বাম চিন্তা ধারা প্রতিফলিত হয়েছে 'তীর' নাটকে। 'তীর' নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর স্মৃতিচারণামূলক 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরই নকশালবাড়ি বিদ্রোহ, জুন' ৬৭ এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিট্‌ল্ থিয়েটারের পদক্ষেপ।... পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকারে থাকুক না কেন!* [৫৮]

মানুষের অধিকার

প্রথম অভিনয় : ১৪ জুলাই, ১৯৬৮, মিনার্ভা।

প্রথম প্রকাশ : গন্ধর্ব, শারদীয় ১৯৬৮। পরে এপিক থিয়েটার, অষ্টম সংখ্যা, ১৯৬৮।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' পর্বে মিনার্ভাতে অভিনয়ের সময় 'অজেয় ভিয়েৎনাম' এবং 'তীর' নাটকের পরেই উৎপল দত্ত 'মানুষের অধিকার' নাটকটি প্রযোজনা করেন। এই নাটকটি প্রযোজনা করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। কালো মানুষের উপরে সাদা মানুষের অত্যাচার সারা পৃথিবীজুড়ে এক অনিবার্য সত্য। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে যখন সারা দুনিয়া সরব তখন তিনি 'মানুষের অধিকার' নাটকটি রচনা করলেন। দেশে-দেশে, কালে-কালে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের অন্যায় অত্যাচার, ঘৃণা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। উৎপল দত্ত ইতিহাসের পাতা থেকে সেরকমই একটি ঘটনাকে তুলে আনলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মুক্ত সমাজের আড়ালে যে জাতি বিদ্বেষ, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ও নিগ্রো বিদ্বেষের মতো বিষ-বাষ্প লুকিয়ে ছিল, তার বিরুদ্ধে এই নাটকটি এক প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনি নিয়ে রচিত।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের একটি মামলার নির্যাসকে উৎপল দত্ত সমকালীন করে তোলেন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডেট্রয়েট শহরের ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে গোটা আমেরিকার সঙ্গে

এই ডেট্রয়েট শহরেও শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিরোধ এক ভয়াবহ ও তীব্র রূপ নিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ জেগে উঠেছে। তারা পড়ে পড়ে শুধু মার খাওয়া নয়, বরং মারের বদলে পালটা মারের নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অস্ত্র ধারণ করেছে ও রাস্তায় নেমেছে। ডেট্রয়েট শহরের একটি অংশে শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার কৃষাঙ্গ মানুষের দল মুক্তাঞ্চল গড়েছে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সাতদিন ধরে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করেছে ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কিন্তু পারছে না। গ্যান্‌ভিল নামক এক ভিয়েতনাম ফেরত মার্কিন যোদ্ধাকে ব্র্যান নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ ধরে নিয়ে আসেন। কারণ সে রাজপথের উপরে এনিটা হুইটনি নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু গ্র্যান্‌ভিল সে অভিযোগ অস্বীকার করে।–

স্টিভ ।। বে-আইনী প্রবেশ— কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলে?

ব্র্যান।। ধর্ষণ!— হানড্রেট এন্ড থার্টি স্ট্রীটে রাজপথের ওপর এনিটা হুইট্‌নী নাম্নী এক কৃষ্ণকায়া কিশোরীকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল পশুর মত।

মার্থা।। (মেরিনকে প্রশ্ন করে) নাম?

মেরিন।। অগাস্টাস ডেভিড গ্র্যান্‌ভিল।

মার্থা।। র‍্যাংক্?

গ্র্যানভিল।। মেজর, ইউ. এস. মেরিন্‌স্।

মার্থা।। আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন?

মেরিন।। লিস্‌ন্ নিসার হুড্‌লামস! কি জন্য এখানে সশস্ত্র জমায়েত! বা— আমার গায়ে হাত?

স্টিভ।। নোটিশ দেখেন নি? চশমা লাগবে? এটা ডেট্রয়েট শহরে মুক্ত অঞ্চল,— কৃষ্ণশক্তির অধীন।

গ্র্যান্‌ভিল।। আমি ভিয়েৎনাম ফেরত যোদ্ধা। দেশের জন্য লড়াই করে অবসন্ন দেহে ফিরছি গৃহে— ।[৫৯]

কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা অনবরত ধর্ষিত হয়ে আসছে তারও প্রতিবাদ তারা জানিয়েছে, বিশ্বের সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে তারা নিজেদের বোনের মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে যত কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা অত্যাচারিত ও নিহত হয়েছে সেইসমস্ত শিশুকেও তারা নিজের সন্তান জ্ঞান করে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করে। তখন কৃষ্ণাঙ্গ নেত্রী মার্থা বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা এদেশে না হলেও চীনে বা ভারতে, কঙ্গোয় বা ব্রাজিলে ধর্ষণ করেছে। এইসব দেশের বোনরা আর যাতে এই শ্বেতাঙ্গদের হাতে

নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও ধর্ষিত না হয় তার জন্য এদেরকে খতম করা উচিত।–

স্টিভ।। তাহলে তো একে এখুনি শেষ করতে হয়।

মার্থা।। কটি হলদে শিশুর মাথা এনেছেন সঙ্গে করে— বৈঠকখানায় ঝোলাবার তরে? কটি রমণীর স্তনাগ্র?

গ্র্যান্‌ভিল।। কালোদের কাছে জবাবদিহির শিক্ষা পাইনি এখনো।

স্টিভ।। তবে শুনুন, ধূরসবর্ণ নারীধর্ষক! গত সাত দিন ধরে ট্যাংক নিয়ে এ পাড়ায় ঢুকতে পারেননি। আজ একা ঢুকে এনিটা হুইট্‌নীর পবিত্র দেহকে কলুষিত করেছেন— আপনার নোংরা, ফ্যাকাশে দেহের স্পর্শে!— কিন্তু সে জন্যেও নয়— আমার এক ভগ্নীকেও বলাৎকার করে মেরে ফেলেছেন ইতিপূর্বে। আর আমার এক শিশু সন্তান! বয়স চার কি পাঁচ— তাকেও হত্যা করেছেন ক্লেমথ্রোয়ার ছেড়ে!

গ্র্যান্‌ভিল।। তুমি উন্মাদ! তোমাকে আমি চিনিই না। তোমার ভগ্নী বা সন্তানকে চক্ষেই দেখিনি।

স্টিভ।। মিছে কথা কইলে পরে জিভ যাবে খসে। বোনটির আমার অল্প বয়স— ভেবেছিলাম আমেরিকার উদার রাত্রি তার গায়ে দেবো জড়িয়ে।– নিউইয়র্কের নিয়নবাতি দিয়ে গড়ে দেবো তার মুকুট! আমেরিকার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দিয়ে বাজাবো দামামা,— তারপর সেটাকে রেকর্ড করিয়ে— ভেবেছিলাম আমার বোনের হাত ধরে নাচবো তার তালে তালে— লেনক্স এভিন্যুর ওপর।– তুমি তাকে ধর্ষণ করেছো সৈনিক।

গ্র্যান্‌ভিল।। মিথ্যা! মিথ্যা— এ অভিযোগ : শুনুন সবাই কোথায় ধর্ষণ করেছি তোমার বোনকে? এই শহরে আমার এই প্রথম পদার্পণ।

স্টিভ।। এ শহরে নয়— ভিয়েৎনামে। আমার সন্তান ও ভিয়েৎনাম! কতো রাত তার হাত ধরে বেড়িয়েছি আমার স্বপ্নের আমেরিকায়— আকাশে ছড়ানো যখন রূপোর শিশির বিন্দুর মত তারা আর মার্কিন শ্রমিকের হাতে গড়া সোনার শহরে যখন চোখ ঝলসানো আলোকমালা! [৬০]

উৎপল দত্ত আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের যন্ত্রণা এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করে তোলেন। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের লড়াই সমগ্র বিশ্বের সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গদেরও লড়াই। ব্রাজিল, কঙ্গো, ভারত, ভিয়েতনামের মানুষের যন্ত্রণা, তাদেরও যন্ত্রণা। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের কৃষ্ণাঙ্গ বোন ও সন্তান, যেন তাদেরই নিজস্ব সন্তান। কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ নয়। শুধু আমেরিকার এক প্রান্তে আবদ্ধ লড়াই নয়।

এই লড়াই ও সংগ্রাম বিশ্বের সব শোষিত-নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক যুদ্ধের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

যুদ্ধ ফেরত এই শ্বেতাঙ্গ যুবক গ্র্যান্‌ভিলের জন্য সকলে অনুকম্পা বোধ করল। আর্জি জানায় গ্র্যান্‌ভিলকে প্রাণে না মেরে তাকে ক্ষমা করে দিতে। তখনই কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা স্টিভ এইসব অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ যুবকদের ১৯৩১ সালে আমেরিকার দক্ষিণে এলাবামা রাজ্যের পেন্টরক রেল স্টেশনে ঘটে যাওয়া একটি ধর্ষণের কাহিনি শোনায়। তারা শোনায় কী করে শ্বেতাঙ্গদের কাছে কৃষ্ণাঙ্গরা নিরাপরাধা হওয়া সত্ত্বেও নানারকম শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, তার ঘটনাবৃত্তান্ত। শোনায় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের নানান ঘটনা পরম্পরা। নাটকের মূল বিষয় এই স্কটস্‌বরো মামলার বিচার দৃশ্য। সেখানে ধর্ষক রূপে অভিযুক্ত এক নিগ্রো যুবক হেউডপ্যাটার্সন। আর ধর্ষিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ দুই মহিলা রুবি বেট্‌স্ ও ভিক্‌টোরিয়া। ১৯৬৭-এর এই ডেট্রয়েট শহরের ঘটনা এই নাটকের প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্টরূপে যুক্ত করে মূল ঘটনাকে সমকালীন মাত্রায় নিয়ে এসেছেন উৎপল দত্ত।

নাটকের কাহিনি প্রবেশ করে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, সেখানে দেখা যায় আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত এলাবামা রাজ্যের পেন্টরক রেল স্টেশন। সেখানে স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর যায় কয়েকজন নিগ্রো যুবক ট্রেনের মধ্যে কিছু শ্বেতাঙ্গ যুবককে প্রহার করেছে এবং তারা পরের ট্রেনেই এই পেন্টারক স্টেশনে আসছে। শ্বেতাঙ্গ স্টেশন মাস্টার ক্রস্‌বি দ্রুত খবর দেয় স্থানীয় সব জোরদারদের কাছে। নিগ্রোদের পেটানো হবে এই খবর শুনে জোরদাররা স্টেশনে এসে উপস্থিত হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে। তাদের কথাবার্তায় ফুটে ওঠে নিগ্রো পীড়নের পাশবিক উল্লাস ও আনন্দ। নিগ্রোদের পীড়নের মধ্য দিয়েই শ্বেতাঙ্গরা এক অনাবিল আনন্দ খুঁজে পায়। তাদের সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়—

বিল্ ।। বোসো, বোসো।

একটু খাও। ব্যাপারটা কিছু না। ফাঁস, একটু আগুন, একটা চীৎকার— ব্যাস। ঐ চীৎকারটায় একটু গায়ে কাঁটা দেয়। তাই ডেটাটুরের সেই ভাগচাষীটাকে মারার সময়ে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে গেছলাম। ওরা জাতীয় সংগীত বাজাচ্ছিল খুব জোরে, তাই চীৎকার-ফীৎকার চাপা পড়ে গেল।...

গ্রীন।। বিল! ফাঁস কেন? বড় হ্যাঙ্গামা।

বিল্।। তবে কি চাও?

গ্রীন।। এক এক গুলি ব্যাস্।

বিল্।। দ্যেৎ তাতে মজা কোথায়?

প্রেন্ডিক।। গ্রীন জর্জিয়ান জমিদার। ওদিকে গুলিটাই বেশী চলে। এখানে গ্রীন, আমরা একটু ছড়িয়ে বসে উপভোগ করতে চাই।

গ্রীন।। করতে চান করুন। তবে গুলি করলে চট করে হয়ে যায়।

প্রেন্ডিক।। চট করে করার নীতিটা উত্তরের কারখানা-সভ্যতা থেকে আমদানী। দক্ষিণে-জীবন একটু মন্থরগতি। মৃত্যুটাও তেমনি হলে ভালো হয়। [৬১]

কিছুক্ষণের মধ্যেই ন'জন নিগ্রো কিশোরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্টেশনে নিয়ে আসে এলাকার ডেপুটি শেরিফ হিল ও জোরদাররা। নিগ্রোদের হত্যা করার বাসনায় তারা অস্থির হয়ে ওঠে। নিগ্রোহত্যার জন্য যেন তাদের হাত নিশপিশ করতে থাকে ও হত্যা দেখার জন্য কিছু মানুষের চোখ উৎসুক হয়ে ওঠে। হিল জেরা শুরু করে নিগ্রো কিশোরদের, তারা জানায় তারা ট্রেনে চড়ে মেমফিস শহরে যাচ্ছিল কাজের সন্ধানে। এমতাবস্থায় হে-উড প্যাটারসন নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক স্বীকার করে যে তারা শ্বেতাঙ্গ কৃষক মেরেছিল কেন-না শ্বেতাঙ্গ যুবকরা আগে প্রহার করেছিল। অন্যদিকে জোতদাররা দুটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে ডেপুটি শেরিফ হিলের কাছে হাজির করে এবং দাবি করে ওই নিগ্রো যুবকরা এই শ্বেতাঙ্গ কিশোরীদের ধর্ষণ করেছে। দুই শ্বেতাঙ্গ কিশোরী ভিকটোরিয়া প্রাইজ ও রুবি বেটস— এরা দুজনও অভিযোগ করে যে তারা নিগ্রোদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। বাইরে উপস্থিত উন্মত্ত জনতার পাশবিক উল্লাসে মত্ত তারা অপেক্ষা করতে থাকে এই নিগ্রো যুবকদের তারা যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপহার দেবে। এমতাবস্থায় ডেপুটি শেরিফ হিল নিগ্রো আসামীদের থানায় নিয়ে যেতে চাইলে এলাকার শেরিফ ওয়ারেন বাধা দেন এবং বিচারের দায়িত্ব আদালতের উপর ন্যস্ত করেন। এই ঘটনা নিয়েই শুরু হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের স্কট্স্বরো মামলা।

ডেকাটুর শহরের আদালতে মামলা শুরু হয়। জেরা, সওয়াল জবাব, সাক্ষ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ঘটনার বিবরণ, তথ্য প্রমাণ সব নিয়ে আদালতে চলতে থাকে বিচারের পর্বগুলি। কালো মানুষের উপরে শ্বেতাঙ্গদের বহুদিন ধরে চালিয়ে আসা নির্মম নির্যাতনের আরো একটা অধ্যায় যেন এতদিনের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। বিচারের ফলাফল যেন আগে থেকেই তৈরি। প্রচুর শ্বেতাঙ্গ দর্শক এসেছে নিগ্রোদের নির্মম পীড়ন দেখতে। তারা উত্তেজিত, উল্লিখিত ধর্ষণের বিচার দেখতে লালায়িত। একজন বলে—

ধর্ষণের মামলা দেখতে বেশ লাগে। এমন সব কথা বলে যে শরীর গরম হয়ে ওঠে। [৬২]

আরো কিছু দর্শকদের মুখ দিয়ে শুনতে পাই—

দর্শক-১।। অনেক আগে পৌঁছে গেছি। টিফিন প্যাকেটটা এনেছিস তো?

দর্শক-২।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবো আর দেখবো।

গ্রীন।। যা বলেছিস; একে নিগার, তার ধর্ষণের মামলা!

দর্শক-৩।। বাইরে বিরাট পোস্টার মেরে এলাম, "এলাবামায় নিগাড়দের ঠাণ্ডা করো! [৬৩]

নাটকটির মূল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে আদালতের বিচার দৃশ্যে। আসামী পক্ষের উকিল মিস্টার স্যামুয়েল লিবোভিট্স এবং সরকারি পক্ষের উকিল টম নাইট। সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতি তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দান, লিবোভিট্স-এর অসামান্য সওয়াল ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে বিচার এগিয়ে যেতে থাকে। সাক্ষীরা হলেন সকলেই নাইটের শেখানো সাক্ষী। নাইট যখন প্রশ্ন করেন তখন সুকৌশলে সাক্ষীদের মুখে উত্তরটাও গুঁজে দেন। কিন্তু লিবোভিট্স-এর বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক-বিতর্ক, গভীর অনুভব ও মেধাসম্পন্ন জেরা ও সওয়ালের দ্বারা সকল সাজানো সাক্ষীদের তছনছ করে দেন। কখনো জেরা করতে করতে সাক্ষীর অগোচরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, আবার কখনো কখনো কথার মারপ্যাঁচে সাক্ষীর সতর্কতাকে চূর্ণ করে দেন, কখনো সাক্ষীর উপরে চাপ সৃষ্টি করেন, কখনো সত্যি কথাটা সাক্ষীকে বলতে বাধ্য করেন বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে, আবার কখনো অকাট্য প্রমাণ দর্শিয়ে সাক্ষীকে নিরুত্তর করে দেন। তবুও বিচারের নামে যে প্রহসন চলে সেটা দেখা যায় বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর ভূমিকায়। তিনি একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও সদাসর্বদা তার অন্তরে জাগ্রত নিগ্রোবিদ্বেষ। সরকার পক্ষের আইনজীবী নাইট-এর মতো সোচ্চারভাবে বর্ণবিদ্বেষী হতে পারছেন না, কারণ তিনি একজন আইনজীবী। আবার অন্তরে চিরকাল পুষে রাখা নিগ্রোবিদ্বেষকেও ভুলে থাকতে পারছেন না। নিগ্রোবিদ্বেষ বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর মধ্যে কতটা পরিমাণ বিষবাষ্পের ন্যায় ছড়িয়ে আছে, তা তার উক্তি থেকেই বোঝা যায়—

লিবো।। মাননীয় মিস্টার ক্যালাহ্যান ঐ "নিগার" শব্দটি যেন এটর্নি জেনারেল আর ব্যবহার না করেন এই হুকুম দিন।

ক্যালা।। কেন?

লিবো।। কথাটা ঘৃণ্য জঘন্য গালাগাল।

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্স, দক্ষিণে দৈনন্দিন ব্যবহার হয়। গালাগালি নয়।

লিবো।। দৈনন্দিন কেন, প্রতি সেকেণ্ডে ব্যবহার হলেও ওটা গালাগাল। অভিধানে ওটাকে গালাগাল বলা হয়েছে, দেখতে পারেন।

ক্যালা।। অভিধান জানি না, এলাবামায় কথাটির কোনো অবজ্ঞাসূচক অর্থ নেই। ওকথা নিষিদ্ধ করা যায় না। যার যেমন অভিরুচি বলতে পারেন।। [৬৪]

বিচারপতি প্রাথমিক পর্বে নিরপেক্ষভাবে বিচার শুরু করেন। নাটক এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিচারপতির মুখোশ খুলতে থাকে। নিগ্রোবিদ্বেষ ক্রমশ বেরিয়ে আসে, এবং বিচারের শেষপর্বে মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে একজন বর্ণবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। একজন আইন রক্ষক হয়েও আইনের রক্ষার নামে প্রহসনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। যখন দেখেন লিবোভিট্‌স-এর জেরার সামনে সরকারি পক্ষের উকিল নাইট ও তার সাজানো সাক্ষীরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে তখন বিচারপতি ক্যালহ্যান আসরে নামেন। তিনি বুঝতে পারেন এভাবে বিচার চলতে থাকলে লিবোভিট্‌স-এর যুক্তি তর্ক খণ্ডন করে আসামীকে শাস্তি দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তখন তিনি সুচতুরভাবে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলার কাজে প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেন। কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের শাস্তি দেওয়া। প্রথম সাক্ষীকে লিবোভিট্‌স বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচে ও যুক্তিতর্কে পর্যুদস্ত করার পর নাইট যখন সাক্ষীর মুখে উত্তর গুঁজে দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তখন লিবোভিট্‌স অবজেকশান জানান। কিন্তু বিচারপতি ক্যালাহ্যান নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই আপত্তি খারিজ করে দেন।–

লিবো।। অবজেকশন! নিজেই তো সব বলছেন এটর্নি জেনারেল! প্রশ্ন করার দরকার কি? জবাবগুলো নিজেই জুরিকে বলুন সরাসরি।

ক্যালা।। ওভাররুলড্!

লিবো।। আই বেগ ইওর পার্ডন?

ক্যালা।। বললাম আপনার আপত্তি নাকচ হলো।

লিবো।। এই আপনার রায়? এটর্নি জেনারেল সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে সাক্ষীকে উত্তরগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন—

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্‌স, আপনার আপত্তি খারিজ হয়েছে, বসুন। [৬৫]

বিচারের নামে প্রহসনের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে নাটক এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে। তৃতীয় সাক্ষীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ক্যালাহ্যান একেবারে সক্রিয় হয়ে সরকারি উকিল নাইটের সঙ্গে সঙ্গ

দিতে থাকেন। নাইট প্রত্যেক সাক্ষীকে প্রভাবিত করতে থাকেন ও তাদের উত্তর সাজিয়ে দেন। এরকম প্রতিটি প্রশ্নেই লিবোভিট্‌সের তরফ থেকে যখন অবজেকশান জানানো হয় বিচারপতি সেই লিবোভিট্‌সের অবজেকশান সরাসরি খারিজ করে দেন। আবার যখন লিবোভিট্‌সের যুক্তিতর্ক নাইটের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয় তখন ক্যালাহ্যান প্রত্যেকটা আপত্তিকে সসম্মানে মঞ্জুর করেন। বিচারপতি ক্যালাহ্যান কতটা পক্ষপাতদুষ্ট তা তাদের কথোপকথন থেকেই স্পষ্ট—

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেন্ড!

লিবো।। কি কারণে?

ক্যালা।। প্রত্যেকবার কারণ দর্শাতে আমি বাধ্য নই। নিন প্রশ্ন করুন।

লিবো।। মিস্টার গিলি, আপনাকে নিগ্রোরা চুপ ক'রে থাকতে বলেছিলো?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। আপনি কি বললেন?

গিলি।। কিছুই বলিনি।

লিবো।। পেন্ট্‌রক স্টেশনে নেমে আপনি নিশ্চয়ই প্রথমে ছুটলেন পুলিশে খবর দিতে?

গিলি।। আজ্ঞে না।

লিবো।। সে কি? অমন একটা কাজ পুলিশকে না ব'লে আপনি গেলেন কোথায়?

গিলি।। খেতে।

লিবো।। ও, তাই বুঝি আপনার জবানবন্দী দেরীতে লিপিবদ্ধ হয়?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। তা অমন বীভৎস দৃশ্য দেখে সেটা লোকের কর্ণগোচর না ক'রে আগে খাওয়া-দাওয়া করতে গেলেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। কি কারণে?

ক্যালা।। বলবো না।

লিবো।। বিচারপতি, কারণ আপনাকে বলতে হবে।

ক্যালা।। বলবো না। অন্য প্রশ্ন করুন।

লিবো।। বিচারপতি, অরভিল গিলি ও পক্ষের একজন মূল সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী। তাকে কিছুতেই প্রশ্ন করতে দিচ্ছেন না, এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ক্যালা।। প্রশ্ন করতে দিচ্ছি না নয়, বে-আইনী প্রশ্ন করছেন বাধা দিচ্ছি।

লিবো।। (চেঁচিয়ে) কিসে বে-আইনী?

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্স, আদালতে গলা তুললে আমিও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। [৬৬]

তৃতীয় সাক্ষী অরভিল গিলিকে জেরা করার সময় এমন একটা সময় আসে যে বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর মুখোশ একেবারেই খসে পড়ে। লিবোভিট্স সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেই নাইট অবজেকশান জানান এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে তৎক্ষণাৎ বিচারপতি ক্যালাহ্যান নাইটের আপত্তি মেনে নেয়। একটা সময় দেখা যায় লিবোভিট্সের প্রশ্নবাণ ঠেকাতে বিচারপতি ক্যালাহ্যান বিচারপতির সমস্ত আদর্শ নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে স্বয়ং লিবোভিট্সের প্রশ্নে অবজেকশান জানিয়ে বসেন। অবজেকশান জানানোর কথা ছিল নাইটের কিন্তু নাইট অবজেকশান জানাতে ভুলে গেলে বিচারপতি সমস্ত ধৈর্য্য ও সংযম হারিয়ে ফেলে নিজেই অবজেকশান জানান। নিজের অন্তরের বিষাক্ত নিগ্রোবিদ্বেষ নির্লজ্জভাবে বেরিয়ে আসে সকলের সামনে—

লিবো।। মালগাড়িতে আপনি একা শ্বেতাঙ্গ ছেলে ছিলেন?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। আর কে ছিলো?

গিলি।। দু'টি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে। আর প্যাটারসন এবং তার নিগ্রো সঙ্গীরা।

লিবো।। আপনি কখনো নিগ্রোদের সঙ্গে মারামারি করেছেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। আচ্ছা, আপনি ঘটনার দিন কোনো নিগ্রোর হাতে মার খেয়েছিলেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। ঘটনার দিন আপনার সঙ্গে নিগ্রোদের কোনো বচসা হয়?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। প্যাটারসনকে ঘৃণা করার অন্য কোনো কারণ ঘটে?

ক্যালা।। অবজেকশান!

নাইট।। হ্যাঁ, অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। মিস্টার ক্যালাহ্যান; আপনি আমাকে কোনোমতেই এগুতে দেবেন না ঠিক করেছেন?

ক্যালা।। অর্থাৎ?

লিবো।। বিচারপতি নিজেই অবজেকশান তুলছেন এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম।

ক্যালা।। প্রশ্নটা এমন বে-আইনী যে আমি থাকতে পারিনি।

লিবো।। কিসে বে-আইনী?

ক্যালা।। এ মামলার সরকারী রিপোর্টে কোথাও কোনো মারামারির উল্লেখ নেই। অথচ আপনি বারবার শুনানীটাকে ঐ পথে চালিত করার চেষ্টা করছেন। [৬৭]

সমগ্র আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষের উকিল নাইট এবং বিচারপতি ক্যালাহ্যান চাইছিলেন হে-উড প্যাটারসনকে দোষী সাব্যস্ত করে নানারকমভাবে অত্যাচার করতে। নানারকম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে নিগ্রোপীড়নের আনন্দ উপভোগ করতে চাইছিলেন। বিচারপতি ক্যালাহ্যান ভালো করেই জানেন লিবোভিট্স যদি মামলা চালিয়ে যান তাহলে হে-উড প্যাটারসনকে কোনোভাবেই শাস্তি দেওয়া যাবে না। তাই বিচারপতি ক্যালাহ্যান একসময় বলে ওঠেন—

না পারলে মামলা ছেড়ে দিন। অন্য প্রশ্ন করুন। [৬৮]

বিচারপতি ক্যালাহ্যান চাইছিলেন লিবোভিট্স মামলাটা ছেড়ে দিক তাহলেই নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠানো যাবে। এমতাবস্থায় দুঁদে আইনজীবী লিবোভিট্স

ততোধিক ধূর্ত কায়দায় জেরা শুরু করেন। জেরার মধ্য দিয়ে কিছুটা শ্বেতাঙ্গ প্রীতি দেখাতে থাকেন ও নিগ্রো নিন্দা শুরু করেন। এরফলে সাক্ষীর সতর্কতা চূর্ণ করতে থাকেন, এতক্ষণ সাক্ষী যে নির্জলা মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিলেন পরস্পর, লিবোভিট্‌সের প্রশ্নবাণে দিশেহারা হয়ে সাক্ষীর মুখ থেকে আসল সত্য বার করতে থাকেন। কিন্তু এমতাবস্থায় এগিয়ে আসেন বিচারপতি ক্যালাহ্যান। তিনি সরকারি পক্ষের উকিল নাইটের মতো নিজেও একজন বিচারপতি হয়ে সাক্ষীর মুখে উত্তর গুঁজে দিতে শুরু করেন—

লিবো।। আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না, দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা এত হীনবল, এমন নপুংসক যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ধর্ষিত হতে দেখবে। আমি বলছি কি হয়েছিল। ধর্ষণ হয়নি, হয়েছিল ছেলেতে ছেলেতে মারামারি।

গিলি।। না, ধর্ষণ হয়েছিল।

লিবো।। তারপর শ্বেতকায় ছেলেদের নিগ্রোরা মেরে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়। তোমাকে রুগ্ন বলে ছেড়ে দেয়।

গিলি।। না।

লিবো।। তোমার জবানবন্দী আগাগোড়া মিথ্যা।

গিলি।। না।

লিবো।। নো মোর কোয়েশ্চেনস।

নাইট।। অরভিল চ্যাটানুগা থেকে স্টিভেনস কতদূর?

গিলি।। পঁচিশ মাইল।

নাইট।। এর মধ্যে কেউ ট্রেন থেকে ওঠানামা করেছিল?

গিলি।। না।

নাইট।। ভালো ক'রে ভাবো।

গিলি।। না।

ক্যালা।। তোমার বন্ধুরা?

গিলি।। হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্টিভেনসনের আগে ওরা নেমে যায়।

নাইট।। নো মোর কোশ্চেনস!

লিবো।। বাঃ বিচারপতি নিজেই!! গিলিকে রক্ষা করতে পুরো এলাবামা রাষ্ট্র এগিয়ে আসছে, আমার পক্ষে এগুনো অসম্ভব। [৬৯]

বিচারের যে নির্লজ্জতা, বিচারের নামে যে প্রহসন সেটা ক্যালাহ্যান বিচারপতির আসনে বসেই তিনি দেখিয়ে দিলেন। তিনি একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব করতে থাকেন। এই পক্ষপাতিত্বের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসনকে শাস্তি দেওয়া, তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠিয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপহার দেওয়া। শুধু বিচারপতি নয়, আদালতে উপস্থিত দর্শকরাও শুরু থেকেই নানারকম উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ করতে থাকেন, দুঁদে আইনজীবী লিবোভিট্সের উদ্দেশ্যে কুৎসিত গালাগালি ও তাকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। এমনকি বাইরে বেরিয়ে এলে তার প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিতে থাকেন। বিশাল জনতা এসে হাজির হয় আদালতের দরজায় এবং তারা প্রকাশ্যেই বলতে থাকে নিগ্রো যুবক প্যাটারসন এবং উকিল লিবোভিট্সকে হত্যা করবেন। বিচারের ফলাফল আগে থেকেই জানা। তাদের বিচারে নিগ্রো যুবক দোষী সাব্যস্ত হবেই এবং সে তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আর সেই শাস্তি উপভোগ করার জন্য স্কটস্বরো থেকে এক বিশাল জনতা আদালতের দরজায় এসে উপস্থিত।

নাটক যত এগোতে থাকে বিচারের নামে প্রহসন তত বাড়তে থাকে। বিচার ব্যবস্থাকে যেন সার্কাসে পরিণত করেন বিচারপতি ক্যালাহ্যান ও সরকারি পক্ষের উকিল নাইট। সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয় ভিক্টোরিয়া প্রাইজ, তার অভিযোগ হে-উড প্যাটারসন তাকে ধর্ষণ করেছে। ভিক্টোরিয়া প্রাইজের সাক্ষ্যের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ সাক্ষ্যদানের উপরেই নির্ভর করছে প্যাটারসন সাজা পাবে, না মুক্তি লাভ করবে। সরকার পক্ষের উকিল নাইট, তাকে যেভাবে শিখিয়েছিল ভিক্টোরিয়া প্রাইজ সেইভাবেই দীর্ঘ বিবৃতি দেয়, যার মর্মার্থ এটাই— প্যাটারসন তাকেই ধর্ষণ করেছে।

লিবোভিট্স জেরা করতে ওঠেন ভিক্টোরিয়াকে। একের পর এক পুলিশি রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট, বিভিন্ন হোটেলের তালিকা সব আদালতে পেশ করতে থাকেন। বিভিন্ন প্রমাণাদির সাহায্যে তিনি ভিক্টোরিয়া প্রাইজকে এগোরো বার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে ভিক্টোরিয়া প্রাইজ একজন পেশাদার বারাঙ্গণা এবং প্রমাণ করে দেন প্যাটারসন ভিক্টোরিয়া প্রাইজকে ধর্ষণ করেছিল বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগ আগাগোড়াই মিথ্যা। সবই ছিল সাজানো অভিযোগ— নিগ্রো যুবক প্যাটারসনকে বিপদে ফেলার জন্য শেখানো

অভিযোগ। লিবোভিট্‌স যখন ভিক্‌টোরিয়াকে নাস্তানাবুদ করেন তখন বিচারের নামে প্রহসনেরও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বিচারপতি ক্যালাহ্যান। তার হিংস্র জাতিবিদ্বেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিচারকের চেয়ারে বসে ক্যালহ্যান সরকারি পক্ষের ওকালতি শুরু করেন। প্যাটারসনকে মোক্ষম প্যাঁচে ফেলার নানারকম চেষ্টা ক্যালাহ্যান করতে থাকেন—

ক্যালা।। ডেকাটুরের জুরির মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ নেই। জবাব দাও, পাট্যারসন, তুমি সত্যি কথা বলছো আর শ্বেতাঙ্গ শেরিফ মিথ্যেবাদী?

লিবো।। ডোন্ট আনসার দ্যাট! বিচারপতি— সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট! আসামীকে এমন কিছুই বলতে বাধ্য করা যায় না যা ওর নিজের বিরুদ্ধে যায়!

ক্যালা।। আবার আপনি বই পড়া আইন বিদ্যা তিড়িং বিড়িং শুরু করেছেন!

লিবো।। তা স্যার আইন তো বই পড়েই শেখে, দৈববলে শেখা যায় না।

ক্যালা।। প্যাটারসনকে জবাব দিতে হবে।

লিবো।। ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট!

নাইট।। জবাব দাও, প্যাটারসন, শ্বেতাঙ্গ মিথ্যেবাদী?

লিবো।। ডোন্ট আন্সার দ্যাট, সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট!

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্‌স আপনি ক্রমান্বয়ে ইচ্ছা পূর্বক বাধা সৃষ্টি করছেন। [৭০]

ক্যালাহ্যান নিজে একজন বিচারপতি তা তিনি ভুলে গেছেন, তিনি প্যাটারসনকে শাস্তি দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। প্যাটারসনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিচারপতির নীতি-নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা, সততা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে ক্যালাহ্যানের মন থেকে। ক্যালাহ্যানের এহেন আচরণ দেখে মিস্টার লিবোভিট্‌স বলে ফেলেন—

আপনার জন্মের আগে থেকে আমি আদালতে কথা কইছি। এ রকম বে-আইনি, বিদঘুটে, উদ্ভট বিচার জীবনে দেখিনি। বিচারক খোলাখুলি সরকার পক্ষের ওকালতি করছেন! [৭১]

স্বয়ং বিচারপতি যখন পক্ষপাতিত্বের শিকার হয় তখন বোধহয় বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। শেষপর্যন্ত বিচারপতি ক্যালাহ্যান ও উকিল টম নাইট-এর ষড়যন্ত্রে নিগ্রো যুবক হে-উডকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়—

ক্যালা।। জুরি তোমাকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এলাবামা রাজ্যের আইন অনুসারে

আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখে কিলবি কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে। [৭২]

এই স্কটস্‌বরো মামলাকে কেন্দ্র করে, নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের এই বর্ণনায় সারা বিশ্বের রাজনীতিতে প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদে প্রতিরোধে মুখর হয়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তের বিবেকবান মানুষেরা। ভারত থেকে ভিয়েতনাম, ব্রাজিল থেকে কঙ্গো, চীন থেকে জাপান প্রতিটি দেশের কোনায় কোনায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতিবাদের সুরে মুখরিত হয়েছিল আকাশ-বাতাস। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে উথাল-পাতাল করে দিয়েছিল এই ঘটনাটি। শুধুমাত্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলে ছিল আমেরিকার এই কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের ঘটনাবৃত্তান্ত। 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এ যখন 'মানুষের অধিকার' নাটকটি রাতের পর রাত অভিনীত হচ্ছিল এবং দর্শকদের মনে এর বিরাট প্রভাব পড়তে শুরু করে তখন কিছু পত্র-পত্রিকা এই নাটকের বিরুদ্ধে নানারকমভাবে অভিযোগ তুলতে শুরু করে। এমনকি নাটক যাতে বন্ধ করা হয় তার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে প্রচেষ্টা করতে থাকে। সেকথা উৎপল দত্ত স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি'-তে বলে গেছেন—

> *"দেশব্রতী" পত্রিকা হঠাৎ জেহাদ ঘোষণা করল নাটকটার বিরুদ্ধে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাস্যকর ও নির্বোধ সব অভিযোগ তুলতে লাগল। প্রথম দৃশ্যে 'ব্ল্যাক পাওয়ার' কথাটা কেন লেখা ছিল পর্দায়? ওটা নাকি প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল এক শ্লোগান।* [৭৩]

'মানুষের অধিকার' নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখালেন 'অজেয় ভিয়েৎনাম' নাটকের মতো আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। শুধু সমসাময়িক ভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতি নয়, বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি, যা নিয়ে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিও প্রভাবিত হয়েছিল সেরকম ঘটনা নিয়ে তিনি নাটক সৃষ্টি করেছেন। 'মানুষের অধিকার' নাটকটি তাঁর সেই আন্তর্জাতিক ভাবনারই ফসল। আমেরিকার একটি অংশের এককালীন বর্ণবিদ্বেষের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যকার উৎপল দত্ত সর্বদেশের সর্বকালীন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনাকে দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসে শিকল পরা পরাধীন সব মানুষের কথা রূপেই হাজির করেছেন। ভারতবর্ষে উৎপল দত্ত এই প্রথম 'স্কট্‌সবরো' মামলাকে অবলম্বন করে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অন্যায়ভাবে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে অত্যাচার করে। তাই লিবোভিট্‌সের মতো একজন বিখ্যাত উকিলের জোরালো সওয়ালের পরেও আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলেও মার্কিন প্রশাসনের বর্ণবিদ্বেষের ক্রমাগত কৌশলে কৃষ্ণাঙ্গরা বিনা কারণে শাস্তি পায়।

তবে এ নাটক শুধুমাত্র দেশে দেশে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়ানোর নাটক নয়। যেখানেই মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অবিচার, মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ সেখানে মানুষ তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথনির্দেশক হল নাটক। মানুষের ছদ্ম সততার আড়ালে অসহায় মানুষের প্রতি যে অত্যাচার ও অন্যায় অনবরত ঘটে চলে তারই প্রতিবাদের নাটক। এই নাটক শুধু বিচারের নাটক নয়, মানুষের অধিকার রক্ষার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত দলিল।

ব্যারিকেড

প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২, কলামন্দির, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১ মে ১৯৭৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটি প্রযোজনা করেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭০-এর গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে তখন নির্বাচনের নামে চলছে প্রহসন, কংগ্রেস বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলকেই বা কোনো সরকারকেই তখন টিকতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় যেনতেন প্রকারে মন্ত্রীসভাকে ভেস্তে দেওয়া হচ্ছে। চারিদিকে খুন-জখম ও ধর্ষণ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের বাতাস বারুদের গন্ধে ভরপুর, আকাশ বোমা-বন্দুকের গর্জনে কম্পমান। এরকম রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় উৎপল দত্ত লিখলেন কালজয়ী নাটক 'ব্যারিকেড'। নাটকটি ১৯৩১-৩৩ খ্রিস্টাব্দের জার্মানির পটভূমিতে রচিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের অভ্যুত্থানের মুহূর্তে নাৎসি জার্মানিদের অত্যাচারে সেখানকার সোশ্যালিস্ট দলের তথা গণতন্ত্রপ্রেমী সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার, হত্যা, নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের যে বিপর্যয় সেই প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে। নাৎসি নেতা আডলফ হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটেছিল জার্মানির এইরকম একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। জার্মানিতেও নির্বাচনের নামে একইরকম প্রহসন, যে কোনো উপায়েই তাদের ক্ষমতা দখল, গণতন্ত্রকে শেষ করে ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। জার্মানিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে হিটলার ও নাৎসি পার্টি ক্ষমতা দখল করে। একইরকমভাবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবাংলার কুখ্যাত যে নির্বাচন সে নির্বাচনেও প্রহসন, খুন-জখমের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল ক্ষমতা দখলের মরিয়া প্রচেষ্টা চালায়। পশ্চিমবাংলার ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে জার্মানির ১৯৩১-৩৩ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি একেবারে হুবহু যেন মিলে গিয়েছিল। আডলফ হিটলারের মধ্যে তদানীন্তন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রভূত মিল লক্ষ করা যায়। জার্মানির নাৎসি পার্টি যেন ভারতীয় কংগ্রেস দল— একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও গুণ্ডাদের যে দুর্বিষহ দিনগুলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাবলি উৎপল দত্ত সোজাসুজি নিয়ে এলেন নাটকের বিষয় হিসেবে। সমকালের জীবন্ত ছবি তুলে ধরলেন আলোচ্য নাটকে। সেইসময় ফরোয়ার্ড ব্লক দলের নেতা শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু নিজের বাড়ির সামনেই অজ্ঞাত আঁততায়ী দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হলেন। কিন্তু কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, কমিউনিস্ট দলের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করেছে। উৎপল দত্ত তাঁর 'ব্যারিকেড' নাটক ঠিক সেই সময়কার জার্মানির একইরকম একটি ঘটনাকে জুড়ে দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন প্রকৃত হত্যাকারী কারা ছিল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে। এরপর কংগ্রেস ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন ব্যাপক অত্যাচার রিগিং করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। ছাত্র হত্যা, বিচারপতি হত্যা সবকিছুর দায় কমিউনিস্টের উপরে চাপিয়ে দিতে শুরু করল ও কমিউনিস্টদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করতে শুরু করল। সেটা রাস্তার মোড়ে অথবা জেলের ভিতরে, পাড়ার গলিতে অথবা থানার লকআপে। তিনি স্বচক্ষে নারী ধর্ষিত হতে দেখলেন কলকাতার থানার লকআপে অথবা বাসন্তীতে। তা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো সংবাদপত্রগুলির শুরু হয়েছিল নির্লজ্জ বেসাতি। অথচ এই অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা একপ্রকার নিশ্চুপ অবস্থায় ছিলেন যা উৎপল দত্তকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় উৎপল দত্ত প্রত্যাঘাতের পথে হাঁটলেন তাঁর নাটক নিয়ে। তাঁর ভাষায়—

> *তখন চতুর্দিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছে, সি.পি.আই(এম)-এর একজন সদস্যও তখন নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না, তাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না, এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'। বহিরঙ্গের দিক থেকে নাটকটি ছিল হিটলারের অভ্যুত্থান নিয়ে, রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের মামলা নিয়ে, এবং সেই সন্ত্রাসের পটভূমিতে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের নপুংসকতা নিয়ে।* [৭৪]

নাটকের শুরুতেই দেখি নাটকের সূত্রধার ও একজন বাঙালি শ্রমিক কলকাতার রাস্তায় কথা বলছে। সূত্রধার লাল ফৌজের বিপ্লবী গান গাইছে। শ্রমিক তাকে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় দাঁড়িয়ে বিদেশি গান কেন? উত্তরে সূত্রধার বলে—

বিপ্লবের গানে আবার 'দেশী-বিদেশী' কি? তুমি কি বিপ্লবের ব্যাপারে বিলাতি বর্জন করো নাকি? আমি মনে করি পুরো বিশ্বটাকে কলকাতার আঙিনায় এনে হাজির করতে পারলে তবে আমি বাঙালি। [৭৫]

নাটকে জার্মানির রাজনীতির মধ্য দিয়ে কলকাতার রাজনীতিকে তুলে ধরা হবে। সূত্রধারের উক্তিতে ও নাটকের এই গৌরচন্দ্রিকার মধ্য দিয়ে তার একটি প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। সূত্রধার নাটকের প্রদত্ত নাম প্রসঙ্গে বলে—

যদিও ব্যারিকেড কথাটাও বিদেশী। কিন্তু দুনিয়ার সব মজদুর জানে কথাটার মানে, কারণ ডাস্টবিন, পাইপ আর ইঁট ফেলে যখন রাস্তা অবরোধ করে লড়তে হয় তখন নিউইয়র্কের হার্লেম আর কলকাতার খিদিরপুর এক হয়ে যায়। [৭৬]

এরপরই শ্রমিক আবার যখন সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় আজকের পালায় কোন কোন চরিত্র আছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মঞ্চের উপরের পর্দা উঠে যেতেই কিছু জীবন্ত মানুষের মুখ। এরা হলেন নাৎসি নেতা রোহান লিপার্ট, ফ্রাইয়েৎসাইটুং পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক হাইনরিশ্ লান্টু, বিচারপতি আলকেট ফস, ডাক্তার হেরমান স্ট্রবেল, গৃহবধূ ইংগেবরৎসাউবিৎস প্রভৃতি। এরপর বাঙালি শ্রমিক প্রাচীরের কাছে গিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চায় এবং জার্মান চরিত্ররা বাঙালি শ্রমিককে নিজ নিজ পরিচয়ও জানায়। এক মুহূর্তে বার্লিন ও বাংলা এক সূত্রে বাঁধা পড়ে যায়। নাটকের কাহিনি, পাত্রপাত্রী, ঘটনার দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি সবই জার্মানির পরিবেশে রচিত হলেও ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জার্মান চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালি চরিত্রের ছায়াপথ লক্ষ করা গিয়েছিল।

সূত্রধার ও বাঙালি শ্রমিকের কথোপকথনের পরেই নাট্যকাহিনি প্রবেশ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জার্মানির রাজনৈতিক পটভূমিতে। সেখানে দেখা যায় আডলফ হিটলার প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আডলফ হিটলারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রাস্তা জার্মান সাধারণ নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর। ক্ষমতার লোভ ও লালসার একটার পর একটা নির্বাচন করা, যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন গ্রহণ করছে ততক্ষণ মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া, বিরোধী দলের উপরে অকথ্য অত্যাচার, নৃশংস নির্যাতন প্রভৃতি কিছুই বাদ দিল না। বাদ যায়নি বৃদ্ধ হত্যা থেকে নারী ধর্ষণ। কীভাবে হিটলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তার নেপথ্য কাহিনি তুলে ধরেছিলেন সত্যের পূজারি, সত্যান্বেষী রিপোর্টার অটো বিরখোলৎস। তাঁর পত্রিকার রিপোর্ট থেকে নাৎসিদের অত্যাচারের কাহিনির আভাস আমরা পেয়ে থাকি—

এ বড় বিচিত্র দেশ। এখানে অনবরত নির্বাচন হয়। তিন বছরে জার্মেনিতে পাঁচবার নির্বাচন হয়ে গেল। ১৯৩০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নির্বাচন হ'ল। তাতে আইনসভার ৬০৮ টা আসনের মধ্যে হিটলারের নাৎসি পার্টি পেল ১০৭ টা আর শ্রমিক পার্টিগুলি পেল ৩৫০। ৩৫০ থেকে ১০৭ স্বভাবতই বেশি: তাই রাষ্ট্রপতি হিটলারকেই ডেকে পাঠালেন মন্ত্রিসভা গড়বার জন্য। কিন্তু লোকে অঙ্কশাস্ত্র বোঝে না, তারা ক্ষেপে উঠে গণ্ডগোল লাগাতে আইনসভা ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন ১৯৩২ সালের মার্চে। আবার হিটলার হারলেন। তাই ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ১০ই এপ্রিল ১৯৩২, এবং তাতে ফের হিটলার হেরে গেলেন। তখন ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ৩১ শে জুলাই ১৯৩২, এবার নাৎসি পার্টি পেল ২৩০টি আসন, শ্রমিক পার্টিগুলি ২২২টি। কিন্তু গোল বাধলো ছোট, ছোট দলগুলো, সব গিয়ে জুটলো কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায়। ফলে আইনসভায় ২৩০ জন নাৎসির বিরুদ্ধে দাঁড়ালো ৩৭৮ জন নানা পার্টির সদস্য। সুতরাং আবার গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। ৩০শে আগস্ট আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই আইনসভা বাতিল করে দিয়ে ফের নির্বাচন— ৬ই নভেম্বর ১৯৩২। এবার নাৎসিরা পেল ১৯৬টা আসন, শ্রমিক পার্টিগুলো ২২১। আর অন্যান্য দলগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করতে আইনসভায় শক্তি দাঁড়ালো— নাৎসি ১৯৬, নাৎসি-বিরোধী ৪১২। এখন একথা ইস্কুলের শিশুও জানে ৪১২-এর চেয়ে ১৯৬ বেশি। তাই আজ সকাল শোয়া দশটায় ঐ ১৯৬-এর নেতা হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে, এবং আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের পুনরায় আাবার নির্বাচন ধার্য হয়েছে, আগামী ৫ই মার্চ। [৭৭]

হিটলারের ক্ষমতা দখলের খুঁটিনাটি ও তৎকালীন জার্মান রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই বিবরণে। নির্বাচনের নামে নির্লজ্জ প্রহসন পরিলক্ষিত হয়, যেমনটা কলকাতায় পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতার ইতিহাসে সে-সময়ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, বোমা-পিস্তলের শব্দ, বহু রাজনৈতিক হত্যা দিনের পর দিন ঘটে চলেছিল। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল বার্লিনের রাস্তায়। দিনের পর দিন চলত নাৎসি ও কমিউনিস্টদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ। বার্লিন প্রত্যক্ষ করেছিল একের পর এক রাজনৈতিক খুন ও প্রতিহিংসা। সত্যান্বেষী রিপোর্টার অটো বিরপোলৎস-এর রিপোর্ট থেকে আমরা আরও জানতে পারি—

বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় চলছে নাৎসি আর কমিউনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধ। গত ছ'মাসে ৪৬১ টা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে পিস্তল, বোমা, ছুরি আর বিয়ারের বোতল নিয়ে। এক মাসে এ শহরে ৮৩টি রাজনৈতিক খুন হয়ে গেছে। সকলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আগ্‌লাচ্ছে; সন্ধ্যের পর বার্লিনের রাজপথে লোক হাঁটে না। [৭৮]

নাৎসিদের প্রচারের একটা মূল ধারা ছিল, যেটা হল আবেগের রাজনীতির প্রচার। মানুষের

আবেগে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করে তার যুক্তি, বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া। বার্লিনের বিখ্যাত সংবাদ পত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং'-এ খবর আসে শ্রদ্ধেয় ও সর্বজন বন্দিত জননেতা ও দেশপ্রেমিক সত্তর বছরের বৃদ্ধ য়োসেফ ৎসাউরিৎস প্রকাশ্য দিবালোকে তার বাড়ির সামনে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। এই খুনের জন্য নাৎসি নেতা লিপার্ট প্রকাশ্য জনসভায় কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করেছেন এবং আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টিদের সমূলে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানিয়েছেন যোসেফ ৎসাউরিৎস এই হত্যাকাণ্ডের খবর বার্লিনের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক লান্টকে জানান নাৎসি নেতা লিপার্ট পত্রিকার সম্পাদক লান্ট নিজেকে সদা সর্বদা সত্যের পূজারি বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি লিপার্টের কথা শুনেই সত্যতা বিচার না করে সিদ্ধান্তে আসেন য়োসেফ ৎসাউরিৎস-কে খুন করেছেন কমিউনিস্টরা। যদিও তার এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে অকাট্য কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর এই হত্যাকাণ্ড দেখে দর্শকদের মনে পড়ে যায় কলকাতায় তখন সদ্য ঘটে যাওয়া ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু হত্যাকাণ্ডের কথা। যিনি তার বাড়ির কাছে আততায়ী দ্বারা নিহত হন। এবং কিছু পত্র-পত্রিকা একইরকমভাবে ব্যাপক প্রচার শুরু করে দেয় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী একমাত্র সি.পি.আই(এম)। তখনকার কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে স্মরণ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেন—

> *১৯৭১ সালে, নির্বাচনের ঠিক আগে, অশীতিপর বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংবাদপত্র— যারা নিরপেক্ষতার বড়াই করে— তারা ব্যাপক প্রচার শুরু ক'রে দেয়, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সি.পি.আই(এম) দায়ী। পুলিশ তদন্ত শুরু করার আগেই সব কংগ্রেসি নেতা চিৎকার শুরু ক'রে দেন— খুনি সি.পি.আই(এম)-এর হাত রক্তে লাল। এবং এই যৌথ প্রচারকার্যে গলা মেলান বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ।* [৭৯]

নাৎসি নেতা লিপার্ট যেমনভাবে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি কমিউনিস্টদের উপর চাপিয়েছেন, ঠিক একইরকমভাবে একই লক্ষ্যে ধাবিত হয় সংবাদপত্রের প্রচারও। পত্রিকা সম্পাদক লান্ট তার অফিসের সমস্ত কর্মচারীদের নির্দেশ দেন— পরের দিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার খবর বড়ো করে করে ছাপাতে হবে। অন্য সমস্ত খবরকে ভিতরের পাতায় রাখতে হবে এবং প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হেডলাইন করে কমিউনিস্টদের দোষী করে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডের খবর ছাপতে হবে। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে এই হত্যাকাণ্ডের খবর একটানা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হবে। পত্রিকা সম্পাদক

লান্ট, যিনি সত্যের পূজারি হিসেবে দাবি করেন, তিনি হলেন শাসক শ্রেণির অনুগত। সত্যবাদিতার ভেক ধারণ করে মিডিয়া আসল খবরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, নিজের আখের গোছাবার জন্য। তারা সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে, মিথ্যাকে সত্যে। জনতাকে বিভ্রান্ত করে, মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেয় এইসব স্বার্থপর সংবাদপত্রগুলি। পত্রিকা সম্পাদক লান্টের কথার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে তিনি এই লোভী স্বার্থপর শাসকের কতটা অনুগত ছিলেন, কতটা পদলেহন করতেন শাসক শ্রেণিকে—

> *রিপোর্টটি মিথ্যা সেকথা আমি বলছি না। বলছি তোমার বিচিত্র ভাষার কথা। তুমি লিখেছ "তখন পুলিশ গুলি চালায় এবং তাতে মিছিলের তিনজন শ্রমিক নিহত হয়।" এটা কি? তুমি কি মদ খেয়েছ নাকি? ... বুঝতে পারছ না? প্রথমত, "পুলিশ গুলি চালায়" এমন কথা আমার কাগজে বেরুতে পারে না। লিখবে, "পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়।"... তর্ক আমি শুনতে চাই না। পুলিশ সবসময় বাধ্য হয়। বাধ্য না হলে তারা গুলি চালাতে পারে না— চালায় না। এটাই নিয়ম। দ্বিতীয়ত, বাধ্য যখন হতেই হবে, তখন বাধ্য হবার কারণটা কোথায়? ... আমি খুব ভাল করে জানি মাগ্‌ভেবুর্গের ধর্মঘটে শ্রমিকরা মিছিল করছিল, কিন্তু সেটা লেখা যায় না, শুধু সেটা লিখেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। জার্নালিজম-এর কিছুই বোঝে না। শ্রমিকরা নিরীহ ভেড়ার পালের মত মিছিল করছে আর পুলিশ গিয়ে হামলে পড়ল, একথা ছাপা যায় না। ধর্মঘটিরা মিছিল করলেই পুলিশ বাধ্য হতে পারে না। সুতরাং আমি এইভাবে জিনিসটা লিখছি— "পুলিশ উগ্রপন্থী কমিউনিস্টদের ঘাঁটি খানাতল্লাসি করতে গেলে তারা পুলিশের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে পুলিশ পাল্টা গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়" (অটো চলে যাচ্ছিল) তুমি যাচ্ছ কোথায়? বোসো। না তুমি যে বসেই আছ সেটা জানি। ওটা বললাম অটোকে। তৃতীয়ত, তুমি লিখেছ "তিনজন শ্রমিক নিহত হয়"। এটা কী? ... না না, ওসব চলবে না। পুলিশের গুলিতে যে-ই নিহত হোক, সে সর্বসময়ে সশস্ত্র উগ্রপন্থী। আর কাউকে পুলিশ মারে না, অন্তত সংবাদপত্রে মারে না। সুতরাং আমি ঘুরিয়ে লিখছি, "দুজন উগ্রপন্থী নিহত হয়, একজন নিজেদের গুলিতেই মারা যায়।" চতুর্থত, এরপর আমি জুড়ে দিচ্ছি, "আস্তানা থেকে চারটি রাশিয়ান রাইফেল, দশটি পিস্তল, প্রচুর কার্তুজ, লেনিনের বই এবং কিছু ইশ্‌তেহার পাওয়া যায়।" এইবার স্পষ্ট হ'ল কেন পুলিশ বাধ্য হয়েছে। আমার কাগজে ঐ রকমই হবে, ভাল না লাগলে ইস্তফা দাও।* [৮০]

উৎপল দত্ত ভালো করেই জানতেন যে শাসক শ্রেণির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই সংবাদপত্র। কিছু সংবাদপত্র নিজেদের স্বার্থে সর্বদা শাসক শ্রেণির হয়েই প্রচার করে যায়, তারা সত্য মিথ্যার ধার ধারে না। স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা তারা করতে কোনোরকম দ্বিধা বোধ করে না। শাসকশ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদপত্রগুলোও বিরাট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শামিল হয়।

উৎপল দত্ত সংবাদপত্রের এই যে ষড়যন্ত্র, সে সম্পর্কে দর্শকদের বারে বারে সচেতন করে তুলেছেন একাধিক দৃশ্যে। মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেওয়া সংবাদপত্রের মুখোশ খোলার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে একাধিকবার। সত্তর বছরের বৃদ্ধ জননেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে দেখি, পত্রিকা সম্পাদক লান্ট কীভাবে তার সহকর্মী রিপোর্টার অটো বিরখোলৎসকে নির্লজ্জভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন—

লান্ট।। ...কালকের হেডলাইন কি হবে শোনো— পাঁচ কলম ব্যাপী ব্যানার— "আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য।" লিখে নিয়েছ?...

অটো।। দেখুন কাহিনীর আগেই কাহিনীর নাম ঠিক করে ফেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।...

লান্ট।। এখানে সেরকম দুর্ঘটনার কোনো অবকাশ নেই।

অটো।। আছে বইকি। "রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য" বলছেন। কি করে জানলেন? আপনি কি ওখানে ছিলেন নাকি? দেখেছিলেন ওরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে নাচছে?

লান্ট।। নৃত্য না করে থাকলেও তুমি কলমের জোরে ওদের নৃত্য করাবে। আমার হেডলাইনের মান রাখবে।

অটো।। কমিউনিস্টরাই যে মেরেছে তার কি প্রমাণ?

লান্ট।। বা! শ্রীমতি ৎসাউরিৎস স্বচক্ষে দেখেছেন, পুলিশ এক কমিউনিস্ট নেতাকে হাতে-নাতে ধরেছে, আরো অনেক প্রমাণ। সেসব জোগাড় করতেই তোমার সান্ধ্য অভিসার। যাও বেরিয়ে পড়ো।

অটো।। আপনার হেডলাইনের আরো ভুল আছে। আপনি বলছেন, "আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতা।" কিন্তু ৎসাউরিৎসের বয়স সত্তর।

লান্ট।। আশিতে ট্র্যাজেডিটা আরো পোক্ত হয়।... তাঁর গায়ে নাৎসিরা হাত দিতে পারে না। বাকি থাকে কে? ঐ কমিউনিস্টরা। স্টাইন? লিখে নাও, ওপরে ব্যানার, আশি বছরের বৃদ্ধ ইত্যাদি কমিউনিস্টদের নৃত্য ইত্যাদি— তারপর দ্বিতীয় হেডিং, ৩৬ পয়েন্টের কম যেন না হয়— "স্বামীর উষ্ণ রক্ত স্ত্রীর গায়ে লেপন।" লিখেছ? জেরগুট।

অটো।। এ আবার এক অসুবিধের সৃষ্টি হ'ল। বৃদ্ধার গায়ে আবার রক্ত দিতে গেল কেন? এসব কি করে যে রিপোর্টের মধ্যে গাদবো—

লান্ট।। বাঃ বৃদ্ধা প্রত্যক্ষদর্শী। রক্তের ছিটেও তো লাগতে পারে।

অটো।। বৃদ্ধা কোথায় ছিলেন? কোত্থেকে প্রত্যক্ষ দর্শন করলেন? ধরুন, তিনি যদি দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে খুনটা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাহলে কি লিখবো? কমিউনিস্টরা আঁজলা করে রক্ত নিয়ে ওপর পানে ছুঁড়েছিল? না, একটা পাম্প আর নল এনে দমকলের মতন রক্ত ছুঁড়ে—

লান্ট।। তিনি যেখানে থেকেই দেখে থাকুন, তুমি তাঁকে সড়কের ওপর নিয়ে আসবে। তারপর স্বামীর রক্তচর্চিত শ্রীমতী ৎসাউরিৎসের ভয়ঙ্কর বর্ণনা লিখবে। কমিউনিস্টদের শেষ করতে হবে। [৮১]

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় দুটি প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকে সেই প্রবণতাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক হল সেই সময়কার সংবাদপত্র ও বেতারযন্ত্র রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত অত্যাচার, দমন-পীড়ন ও ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টাকে মেনে নিয়ে এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রগুলোর আখের গুছিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত অত্যাচার ও জবরদস্তিকে মেনে নিয়ে তার সপক্ষে নিরন্তর প্রচার চালিয়ে জনমত গঠন করে। আর এক হল যত্রতত্র নিরন্তর সন্ত্রাস চলাকালে দেশের নাগরিকরা শুধুই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে না, তারা এই ভীরুতা এবং অন্ধভাবে এই অত্যাচার ও অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্র ও বেতারযন্ত্রগুলো মিথ্যা সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়েই নিজেদের যে যুক্তি দাঁড় করায় তা মেনে নিতে বাধ্য হয় আপামর জনতা। তাই বৃদ্ধ জননেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যম ও পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে প্রচার হতে থাকে যে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কমিউনিস্টরাই। ওখানকার প্রথম সারির সংবাদপত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং' প্রথম পাতায় খবর বার করে—

আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য। [৮২]

বৃদ্ধ নেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির শার্লোটেনবুর্গ জেলা সম্পাদক রিখার্ড হুটিগকে। কারণ নির্বাচন জিততে গেলে কমিউনিস্টদের শেষ করে দিতে হবে এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ ষষ্ঠ বারের জন্য যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে সেই নির্বাচনে সুপরিকল্পিতভাবে নাৎসিদলকে জিততেই হবে। তারই কৌশল হিসেবে বৃদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎসকে হত্যা করা হয়।

য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয় রিখার্ড হুটিগকে এবং তার বিচার শুরু হয় আদালতে। আমরা দেখি আদালতের কক্ষে বিচারপতি আলবের্ট ফস-এর সামনে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যা মামলার প্রাথমিক শুনানি চলে। পুলিশের বড়ো কর্তা ক্যাপ্টেন হেস একে একে জেরা করছেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ড: স্ট্রুবেল-কে, তারপর মূল আসামী ধৃত হুটিগকে এবং শেষে

জেরা করা হয় আর এক প্রত্যক্ষদর্শী য়োসেফ ৎসাউরিৎসের স্ত্রী শ্রীমতি ইংগেবর ৎসউরিৎসকে। শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর সঙ্গে হুটিগের কথোপকথন এবং শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর বয়ান এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।–

ইংগে।। সত্তর বছরের বৃদ্ধ য়োসেফ ৎসাউরিৎস তোমাদের মারতে গিয়েছিলেন?

হুটিগ।। তাঁকে আমরা মারিনি। শুনুন ফ্রাউ ৎসাউরিৎস—

ইংগে।। না আর শুনব না। এবার বলব। জবাব দাও— এ ছোরা কার? কার রক্ত এটা? শুকনো রক্তে কী ইতিহাস লেখা আছে এখানে? আরো অনেক মায়ের সর্বনাশ করবে তুমি, আরো অনেক ছেলের প্রাণ নেবে, আরো অনেককে ঠেলে দেবে ফাঁসিকাঠে। সে তো আমি হতে দেব না। পাউল গেছে যাক, অন্য পাউলদের বাঁচাতে হবে। মাননীয় বিচারপতি, যদিও আমার চোখ খারাপ তবু যতদূর মনে হয়, এই রিখার্ড হুটিগই সেই লম্বা লোকটি যে প্রথমে আমার স্বামীকে ছোরা মারে। (আদালতে চাঞ্চল্য) আমার স্বামীর স্নেহ ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে এই অকৃতজ্ঞ বেইমান হুটিগ তাঁকেই খুন করে ছোরা দিয়ে! [৮৩]

রিখার্ড হুটিগ-কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসে সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস। বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং' পত্রিকায় দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করতে করতে সে জানতে পারে এই পত্রিকার ভূমিকা কী। এবং নাৎসিরা কীভাবে গোপনে কমিউনিস্টদের উপরে অত্যাচারের পরিকল্পনা করে চলেছে সেটাও তার নখদর্পণে। সৎ সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা থেকে অটো বিরখোলৎস মূল হত্যাকাণ্ডের স্থানে হাজির থেকে সমস্ত সব সত্য জোগাড় করেন। এইসব তথ্য নিয়ে সে এক গোপন অধিবেশন ডাকেন। সেখানে লিপার্ট, মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস, স্ট্রুবেল, হেস এবং বিচারক ফসের উপস্থিতিতে প্রমাণ করে দেয় যে রিখার্ড হুটিগ নির্দোষ এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোনো যোগাযোগ নেই। রিখার্ড হুটিগকে নির্দোষ প্রমাণে তার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর নেওয়া এক সাক্ষাৎকার। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি অটো বিরখোলৎস শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর বাড়িতে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেন এবং য়োসেফ ৎসাডিরিৎস হত্যা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অনেক তথ্য তিনি জানতে পারেন। সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস ও মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর সাক্ষাৎকারটি ছিল এইরকম—

অটো।। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না, কারণ জবাব দিতে আপনার কষ্ট হবে, তবু জনতার দাবি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জয় ইত্যাদি সব ভয়ঙ্কর জিনিসের স্বার্থে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আপনি কি সত্যিই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী?

ইংগে।। হ্যাঁ

অটো।। আপনি কোথায় ছিলেন?

ইংগে।। দরজায়। গাড়িটা ছিল রাস্তার ওধারে। আমার স্বামী বিদায় নিয়ে রাস্তার ওধারে গেলেন গাড়িতে উঠতে। দরজাটা মাত্র খুলছেন—

অটো।। তারপর কি হ'ল?

ইংগে।। একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষল রাস্তার মাঝখানে। পাঁচজন লোক লাফিয়ে নামলো তা থেকে। তারা ঘিরে ফেললো আমার স্বামীকে!

অটো।। তাদের পরনে কি ছিল?

ইংগে।। অতি সাধারণ শ্রমজীবীর পোষাক, মাথায় টুপি। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বাঁ বাহুতে জ্বলজ্বল করছিল লাল ব্যাজ।

অটো।। ৎসাউরিৎসকে তারা ঘিরে ফেললো। তারপর?

ইংগে।। স্পষ্ট দেখতে পাইনি কারণ মনে রাখবেন এটা ঘটেছিল দু-দুটো গাড়ির ওধারে। মনে হচ্ছিল একটা ধস্তাধস্তি চলছে।

অটো।। খুনীরা নাকি চিৎকার করছিল?

ইংগে।। হ্যাঁ— চিৎকার করে বলেছিল, 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ', আর 'রেজফ্রন্ট'।

অটো।। আপনি রিখার্ড হুটিগকে এই দলে দেখেছিলেন?

ইংগে।। ঠাহর করে বলতে পারব না। আমার চোখ খারাপ। তার ওপর দুটো গাড়ির ওপাশে ঘটেছিল ব্যাপারটা।

অটো।। আপনি হুটিগকে চেনেন?

ইংগে।। নিশ্চয়ই। এ পাড়ার সব কমিউনিস্ট ছেলেদের চিনি। আমার স্বামীর খুবই স্নেহের পাত্র ছিল হুটিগ।...

অটো।। তারপর ওরা কি করলো?

ইংগে।। আবার ছুটে এসে ওদের গাড়িতে উঠলো।

অটো।। লাল ব্যাজ আর স্লোগান ছাড়া আর কোনো উপায়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা কমিউনিস্ট?

ইংগে।। হ্যাঁ। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ওরা, 'কমরেড' কথাটা ব্যবহার করছিল।

অটো।। (ঈষৎ উত্তেজিত) সত্যি?

ইংগে।। হ্যাঁ।

অটো।। ঠিক কি বলছিল? দু-একটা কথা মনে আছে?...

ইংগে।। ইয়ে... হ্যাঁ ধরুন— গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো পাশের ছেলেটিকে— কোথায় সেই মোড়টা? কোনদিকে ঘুরব? তখন সে 'কমরেড' কথাটা ব্যবহার করছিল।

অটো।। ওর ভাষায় বলুন। কি বলেছিল ও?

ইংগে।। বলেছিল, 'ভো মুস ইশ আইনবীগেন, কামরেড'। [৮৪]

সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাইরিৎস-এর বক্তব্যের রেশ ধরেই প্রমাণ করে দেন যে, য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যা কমিউনিস্টরা করেননি। তার যুক্তি ছিল য়োসেফ ৎসাউরিৎস যেখানে খুন হন ভালস্ট্রাস, সেটা কমিউনিস্টদের এলাকা। তাহলে কমিউনিস্টরা যদি তাকে হত্যা করে তাহলে গাড়ি ব্যবহার করবে কেন। এবং আরো আশ্চর্যের কথা এটাই ছিল যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে তার সহকর্মীদের 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেছিল। এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, মোড় কোথায়? এখানেই প্রশ্ন যে তারা যদি হুটিগের পাড়ার লোক হন, হুটিগের পরিচিত হন, তাহলে পাড়ার মোড় চিনবে না এমন হতে পারে না। আরও কিছু তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন য়োসেফ ৎসাউরিৎসের খুনি অন্য কেউ— রিখার্ড হুটিগ নন বা তার সহকর্মীরা নন। নাৎসিদের একটা চক্রান্ত মাঝপথে ধরা পড়ে গেল, তাদের মুখোশ খুলে গেল দেশের জনগণের সামনে। বিচারপতি আলবের্ট ফস গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ক্যাপ্টেন হেস-কে মিথ্যা মামলা সাজানো ও রিখার্ড হুটিগকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো, একটি খুন নিয়ে নাৎসি পার্টির ফায়দা তোলা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে আদালত চত্বরে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। নাৎসি দলের নেতা য়োহান লিপার্ট-কে বিচারপতি ফস তীব্র নিন্দা ভাষায় ভর্ৎসনা করেন—

ফস।। আপনি একটা জালিয়াৎ। ক্যাপ্টেন হেস মিথ্যাবাদী। এই পুরো মামলাটা সাজানো হয়েছিল নির্বাচনী চাল হিসেবে। আমার এও ধারণা জন্মাচ্ছে, ৎসাউরিৎসকে খুন করেছিল হয় শাদা-পোশাকে পুলিশ আর নয়তো আপনার নাৎসি গুণ্ডার দল। বিচারপতির উচিত নয় এসব রাজনৈতিক মন্তব্য করা। কোনোদিন করিনি কিন্তু এখন যখন বুঝতে পারছি আপনারা আইনের পবিত্রতা মানেন না,

আপনারা ন্যায়বিচারের টুঁটি টিপে ধরতে চান, তখন আমি মুখ খুলতে বাধ্য। আদালতে উপস্থিত থাকলে শুনবেন কি বলি। [৮৫]

এরপর সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস যোসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার হেরমান স্ট্রুবেল-এর বয়ানকে হাতিয়ার করে সে প্রমাণ করে আঁততায়ী হুটিগ নয়, আঁততায়ী অন্য কেউ। ডক্টর স্ট্রুবেল-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী আক্রান্ত হওয়ার সময় য়োসেফ ৎসাউরিৎস বলেছিলেন—"এ কি! আপনি আমাকে মারছেন কেন?"[৮৬] অভিযুক্ত রিখার্ড হুটিগ মৃত ৎসাউরিৎ-এর প্রতিবেশী, তার ছেলের বন্ধু ও খুব স্নেহের পাত্র ছিল। কিন্তু সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস প্রশ্ন করেন, স্নেহের পাত্রকে কেউ কখনো আপনি বলে ডাকে? আঁততায়ী নিশ্চয়ই অপরিচিত ছিল মৃত য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর। তাই তাকে আপনি বলে ডেকেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় রিখার্ড হুটিগ য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকারী ছিলেন না। অন্য কেউ হত্যা করেছেন যে য়োসেফ ৎসাউরিৎসের অপরিচিত ছিল। সাংবাদিক অটোর কোনো পালটা যুক্তি পুলিশ দিতে পারেন না। বিচারপতি ফস বাধ্য হয়ে রিখার্ড হুটিগকে বেকসুর খালাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এবং তিনি পুলিশকর্তা ক্যাপ্টেন হেসকে বলেন পরের দিন দশটায় আদালতে রিখার্ড হুটিগকে হাজির করতে তখনই তাকে মুক্তি দেওয়ার কথাও তিনি ঘোষণা করবেন। কিন্তু বিচারের নামে প্রহসনের মাত্রাটা এখানে চরমে উঠে যায় বিচারপতির রায় দেওয়ার আগেই হুটিগকে জেলে বন্দি করা হয়। ক্যাপ্টেন হেস বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিটলারের আদেশে হুটিগকে নিরাপত্তা আইন-এ বন্দি করে নিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় পুলিশ। হুটিগ কারাবন্দি, তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন হেসের কথা শুনে বিচারপতি আলবের্ট ফস ক্রোধে ফেটে পড়েন ও তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, এটা বিচার বিভাগের অধিকারের উপর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও গণতন্ত্রের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ। তিনি ক্যাপ্টেন হেসকে তিরস্কার করে আরও বলেন—

ফস।। হুটিগ বিপজ্জনক নয়, আদালতে তার উপস্থিতিটা বিপজ্জনক, বিচারপতি ফস বিপজ্জনক, আদালতটাই বিপজ্জনক, আপনাদের শুধু ভয় জালিয়াতি ধরা পড়ার। সেটা ধরা পড়বে হের লিপার্ট। বিচারপতি ফসকে আপনারা চেনেননি এখনো। হুটিগকে গুম করে এ মামলা চেপে দিতে পারবেন না। [৮৭]

শুধুমাত্র নির্বাচনের নামে প্রহসন নয়, নাৎসিদের প্রহসন চলতে থাকে সর্বত্রই। বিচারপতি আলবেট ফস রিখার্ড হুটিগকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, নাৎসিদের উলটো পথে গিয়ে তাদের তিরস্কার করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরের দিন ভোরবেলায় বিচারপতি ফস যখন হ্রদের ধারে প্রাতঃভ্রমণে বের হন তখন তিনি নৃশংসভাবে খুন হন। সরকারের পক্ষে, তাদের তালে তাল

ঠুকলে বোধহয় বিচারপতি ফসের এমন করুণ পরিণতি হত না। এরপর দেখা যায় নাৎসি পার্টির সরকার গণতন্ত্রের মুখোশ বজায় রাখার জন্য হুটিগ মামলা চালু রাখতে চেয়েছেন। এই মামলায় নতুন বিচারপতি হবেন গিওর্গ টাইখার্ট। এবং আইন অনুযায়ী মামলা আবার গোড়া থেকেই শুরু হবে আর মামলার ফলাফল সেটা ধরেই নেওয়া যায় কি হতে চলেছে। নাৎসি পুলিশ মামলার মূল সাক্ষী সাংবাদিক অটো যিনি হুটিগের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাকে হুমকি দেওয়া হয় যাতে তিনি মামলায় সাক্ষ্য না দেন। নাৎসি সরকার হুটিগ মামলা আবার নতুন করে শুরু করার একটাই উদ্দেশ্য যে মামলায় বিচারের নামে প্রহসন করে কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করা। আঁততায়ী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য রিখার্ড হুটিগকে দেখানো। যাতে জনমানসে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা রচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করতে পারলেই নাৎসি পার্টি প্রভূত সুবিধা পাবে আসন্ন নির্বাচনে।

এরপরের দৃশ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি আর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। বার্লিনের রাইখ স্টাগ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। হিটলার তাঁর বক্তৃতায় সরাসরি তিনি এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন। তিনি আরও ঘটে যাওয়া যে নির্বাচনগুলির অশান্তি ও মারামারির ঘটনায় সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করেছেন। তাই কমিউনিস্ট পার্টিকে দমিয়ে রাখার জন্য হিটলার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ব্যবস্থাগুলো ছিল—

> *১) কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ২) ঐ পার্টির সদস্যদের দেখামাত্র গ্রেফতার করার এবং প্রয়োজনবোধে দেখামাত্র গুলি করে মারার নির্দেশ জারি হল। ৩) আজ থেকে সর্বপ্রকার ট্রেড-ইউনিয়ন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হল। ৪) আজ থেকে সর্বপ্রকার কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ হল। ৫) আজ থেকে সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হল।* [৮৮]

হিটলারের এই ঘোষণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে যে কোনো উপায়ে দমিয়ে রেখে আসন্ন নির্বাচনে নাৎসি পার্টির জয়লাভ করানো। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা তো করা হলই সেই সঙ্গে এই পার্টি সদস্যদের গ্রেফতার ও প্রয়োজনবোধে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশও দিলেন তিনি। যাতে তারা আসন্ন ভোটে লড়ার সাহস দেখাতে না পারে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে তাকালেও আমরা ঠিক একইরকম চিত্র দেখতে পাই সেখানে হেমন্ত বসুর হত্যার দায় কমিউনিস্টদের উপরে চাপানো তো হলই সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে দমিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেস সরকার যতরকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, তা নিল।

হিটলারের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই ঘোষণার পরই শুরু হয় নাৎসিদের তীব্র ও ভয়ংকর অত্যাচার। তারা বেছে বেছে কমিউনিস্টদের ঘর থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে হত্যা করতে থাকে। এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার তারা করতে থাকে যাতে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কমিউনিস্টরা ভোট দিতে যাওয়ার সাহস না পায়। এইভাবে নির্বাচনের দিন এগিয়ে এল। নির্বাচনের দিন সাধারণ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল না। নির্বাচন কেন্দ্রের ধারেকাছে কমিউনিস্টদের আসতে দেওয়া হল না। পুলিশ প্রশাসন, নাৎসি ঝটিকা বাহিনী ও মিলিটারির প্রত্যক্ষ মদতে সেদিন নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। জার্মানির বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ফ্রাইরেৎসাইটুং'-এর সম্পাদক হাইনরিশ লান্ট সারাজীবন ধরে তার পত্রিকায় এই নাৎসি পার্টির হয়ে সমস্ত মিথ্যে সংবাদ ছেপে গেছেন, সমস্ত জীবন ধরে পদলেহন করে গেছেন নাৎসি পার্টির। তিনি নাৎসিদের তাঁবেদারি করে কমিউনিস্টদের নামে সদাসর্বদা দোষারোপ ও নিন্দা করে গেছেন। সেই লান্ট ভোটের সময় নাৎসিদের অত্যাচারে তিনিও বীতশ্রদ্ধ। জার্মানির সাধারণ মানুষ নাৎসিদের অত্যাচারে কতটা বীতশ্রদ্ধ, তা পত্রিকা সম্পাদক লান্টের কথোপকথনে বোঝা যায়—

লান্ট।। এর নাম নির্বাচন? এর নাম গণতন্ত্র? প্রহসন হচ্ছে! বাইরে প্রহসন চলছে। বন্দুকের ডগায় দাঁড়িয়ে জনতা নাকি স্বাধীন মতামত দেবে!

ইংগে।। এত উত্তেজনা কিসের হের লান্ট? বসুন না!

লান্ট।। ফ্রাউ ৎসাউসিৎস, আজ বত্রিশ বছর আমি শার্লোটেনবুর্গ অঞ্চলে বাস করছি। প্রতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে এসেছি। আজ দিতে পারলাম না।

ইংগে।। কেন?

লান্ট।। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডার দল। বলছে আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। চলে যান। আমার পবিত্র ভোটাধিকার আমি প্রয়োগ করতে অক্ষম।

ইংগে।। পবিত্র ভোটাধিকার এভাবে হারাবার মূলে কিন্তু আপনিও আছেন।

লান্ট।। মানে?

ইংগে।। কমিউনিস্টদের খতম করো বলে— এমন শোরগোল তুললেন যে, নাৎসিরা... বন্দুক নিয়ে নেমে পড়লো রাস্তায়।

লান্ট।। কিন্তু আমি ভোট দিতাম নাৎসিদেরই! ওরা বুঝল না।

ইংগে।। তাহলে আর চেঁচামেচি কেন? আপনার ভোটটা ওদের বাক্সেই তো পড়ছে। কত সুবিধে দেখুন। মার্চের এই বাতাসে আপনাদের কষ্ট করে বেরুতে হচ্ছে না— ঘরে বসে আছেন, ওদিকে ভোট পড়ে যাচ্ছে।

লান্ট।। কিন্তু আমার পবিত্র অধিকারটা! [৮৯]

এই চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই কংগ্রেস সরকার ১৯৭১ সালে বামফ্রন্টের কাছে হারার পর সেই ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য তারা এই নাৎসিদের মতো একইরকমভাবে কমিউনিস্টদের উপরে অত্যাচার শুরু করেছিল। কমিউনিস্টদের ভোটকেন্দ্রে যেতে না দেওয়া, পুলিশ মিলিটারি দিয়ে কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার ও হত্যা করা কমিউনিস্ট সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনো কিছুই বাদ ছিল না। ১৯৩৩-এর বার্লিন, ১৯৭২-এর কলকাতা রাজনৈতিক পরিবেশগত দিক দিয়ে একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছিল।

জার্মানির মানুষ নাৎসিদের হাতে এইভাবে অত্যাচারিত হতে হতে ও কোণঠাসা হতে হতে বুঝে যায় ফ্যাসিস্ট নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তারা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাবার তাগিদ অনুভব করে, নতজানু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করাটাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। শুধু কমিউনিস্টরা নয়, অরাজনৈতিক মানুষেরাও এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য একত্রিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করে। নাটকের শেষে তাই দেখা যায় রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সব মানুষ এসে জড়ো হয় ভালস্ট্রাসের ব্যারিকেডে। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গোপন কমিউনিস্ট প্রতিরোধের ঐতিহাসিক কাহিনি এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ভালস্ট্রাসের দৃশ্যে উৎপল দত্ত একটা জিনিস তুলে ধরতে চেয়েছেন সেটা হল কমিউনিস্টদের সংগ্রাম। রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও শাসক শ্রেণির আক্রমণের সামনে তাদের গোপনে সংগঠন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা। যেটা ১৯৭২ সালে বা ৭০ দশকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি সরকারের বাঁধন ছাড়া অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা যখন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও কিন্তু এইরকম সংগ্রাম, তাদের গোপনে সংগঠন গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা সেখানেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভালট্রাস জায়গাটি কমিউনিস্টদের এলাকা বলে পরিচিত, তা সত্ত্বেও এখানে শুরু হয়েছে নাৎসি আক্রমণ। নাৎসি পোস্টার পড়ছে এলাকার দেয়ালে দেয়ালে। এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঢুকে নাৎসিরা কমিউনিস্টদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রহার করছে, গুলি করে হত্যা করছে সার সার দাঁড়

করিয়ে। তাই এখানে কমিউনিস্টদের চালাতে হচ্ছে আত্মরক্ষার লড়াই, তাদের সংগঠনকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চলছে গোপনে মিটিং। কমিউনিস্ট পার্টি যদিও এখন বে-আইনি নয় তারা আসন্ন নির্বাচনে লড়বে, তবুও নাৎসিদের হিংস্র আক্রমণের সামনে তাদের পার্টির কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে অনেকটাই গোপনে। বার্লিনের এই ভয়ংকর বীভৎস ছবি ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। বার্লিনের এই অত্যাচারের ছবি যেন ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের ছবির অনুরূপ। উৎপল দত্ত তাঁর 'ব্যারিকেড' নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> *"১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো।" এবং পর পর ক্ষমতা দখলের জন্য "ব্যাপক রিগিং করা ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তাই খোলা রইল না। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করে বুথ থেকে তাড়িয়ে দিল, তারা বুথ দখল করলো, বন্দুক উঁচিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করলো ব্যালট পেপারে। এ সবকিছুই ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং চরম লজ্জার কথা এই যে, বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি গণতন্ত্রের ওপর এই নগ্ন আক্রমণের সামনে। ... এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'।* [৯০]

নাট্যকার উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকে জার্মানির বিশেষ সময়ের ঘূর্ণাবর্তের কাহিনি নিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য নাটকে কোথাও পশ্চিমবঙ্গের নাম নেই, এখানকার কোনো ঘটনার উল্লেখও নেই। তবুও এই নাটক পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উথাল পাথাল করে দিয়েছিল। নাট্যকার সুকৌশলে জার্মানির পটভূমিকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং তা থেকে মুক্তির যে ছবি এঁকেছেন তা মুহূর্তেই বাঙালি মানুষের কাছে তাদের সমকালীন যে রাজনৈতিক অত্যাচারের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটির মধ্য দিয়ে তিনি জার্মানির পটভূমিকায় পশ্চিমবাংলার মানুষকে উজ্জীবিত ও সচেতন করতে চেয়েছেন। ভিন দেশের এক রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির অধ্যায়কে তুলে এনে তিনি তাঁর নিজের দেশের পাঠক, দর্শক ও জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন, এখানেই তাঁর নাটকের সার্থকতা।

দুঃস্বপ্নের নগরী

প্রথম অভিনয় : ১৬ মে ১৯৭৪, কলামন্দির।

প্রথম প্রকাশ : এপিক থিয়েটার, ১০-২ সংখ্যা, ১৯৭৯-৮০।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয় 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। এটি উৎপল দত্তের একটি স্মরণীয় প্রযোজনা। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন সেই নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস দল সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করল। ক্ষমতা কায়েম রাখতে সবরকম দমন পীড়নের সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল কংগ্রেস সরকার এবং তার স্নেহধন্য নেতা, মন্ত্রী ও মদতপুষ্ট গুণ্ডা মস্তানের দল। পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, গুণ্ডা-মস্তান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলির নির্লজ্জ আঁতাত মানুষকে শোষণ-শাসন করা— সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ অবস্থা। কলকাতা শহর ছিল কলকাতাবাসীর কাছে স্বপ্নের নগরী, কিন্তু শাসক দলের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জনতার উপরে ও কমিউনিস্ট পার্টির উপরে পুলিশ ও গুণ্ডাদের দ্বারা যে দুর্বিষহ অত্যাচার শুরু হয়েছিল তাতে স্বপ্নের নগরী কলকাতা সাধারণ মানুষের কাছে দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে উঠেছিল। গুণ্ডা মস্তান ও পুলিশ রাজের সেই দুর্বিষহ দিনগুলি উৎপল দত্ত একেবারে খোলাখুলিভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়কে নাটকে নিয়ে এলেন। একেবারে সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নাট্য প্রযোজনায় নিজের দেশের সমকালের জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরলেন আলোচ্য নাটকে।

১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের যে অধ্যায় চলছিল তার এক প্রামাণ্য দলিল উৎপল দত্তের এই 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি। সত্তরের দশকের সেই সময়কার দর্পণ হয়ে উঠেছে নাটকটি। নাটকটি থেকে সহজেই অনুমেয় তৎকালীন সময়ের শাসক শ্রেণির নির্মম ও বীভৎস অত্যাচার ও অনাচারের ইতিবৃত্ত। একটা শ্রেণির মানুষ নিজের আখের গোছাবার জন্য সদাসর্বদা তৎপর। মজুতদার, কালোবাজারি, ঠিকাদাররা পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ও গুণ্ডা মস্তানের সহযোগে নিজেদের কারবার চালিয়ে যায় অনায়াসে। বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করা ও তাদের ভিটে ছাড়া করা বা হত্যা করার প্রয়াস সদাসর্বদা। পুলিশ গুণ্ডা-মস্তান ও কিছু স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতার সহযোগে কলকাতার জনজীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অসহনীয় দুর্ভোগ সেদিনকার কলকাতার জনজীবনকে দুঃস্বপ্নের কারাগারে পরিণত করেছিল। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি সম্পর্কে অনুনয় চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্তের 'নাটক সমগ্র'-এর ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাংশে তিনি বলেছেন—

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে প্রশাসন, শাসকদল, বিত্তবান শ্রেণী, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা, লুম্পেন যুবক ও ভাড়াটে খুনী— একযোগে এই রাজ্যকে এক নৈরাজ্যের অবাধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল। কাশীপুর বারাসাত, বেলেঘাটায় গণহত্যা, জেলের মধ্যে থানার মধ্যে নির্বিচারে হত্যা, অনিমা পোদ্দারের মতো মহিলাদের উপর দৈহিক অত্যাচার, হেমন্ত বসু হত্যা, শত সহস্র কমিউনিস্টদের ঘর-বাড়ি, পাড়া এমনকি রাজ্য ছাড়া করা হয়েছে। অন্ধকারের সেই কালো দিনগুলো এখনও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। জীবন জীবিকার আন্দোলন নিষিদ্ধ, গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত, অলিতে গলিতে খুন, সন্ত্রাস, মৃতদেহের মিছিল— সত্তরের দশকের এই কলকাতায় প্রতিবাদী সংস্কৃতিও ছিল আক্রান্ত। নাটকে অসামান্য দক্ষতায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখ ও মুখোশ উন্মোচন করে নাট্যকার ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। [৯১]

নাটকের শুরুতেই দেখতে পাই বড়ো ব্যবসায়ী ও মজুতদার লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে গোপন মিটিং চলছে। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন পুলিশকর্তা মৃগাঙ্ক রায়, কংগ্রেসের যুব নেতা চিন্ময় গোস্বামী ও সংবাদপত্র 'রঙ্গবাণী'-র সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্যে। এরা সকলেই লক্ষ্মণ পালিতের আজ্ঞাবাহী। কারণ এদের সকলকেই লক্ষ্মণ পালিত টাকা দিয়ে কিনে রেখেছেন। লক্ষ্মণ পালিতের সংলাপেই সেকথা প্রকাশ পায়—

লক্ষ্মণ।। এ-হেন সংকটে কাজ-টাজ পুরুন পকেটে— আমায় চেনেন তো? তুলি যদি কনিষ্ঠ আঙুল সব শেয়ালের কাটা যাবে লাঙ্গুল। প্রতি মাসের প্রথম হপ্তায় যে চেকগুলো কাটি সেগুলো কি মনে করেন দান-খয়রাতি? কোনো কম্মেওই যদি না আসেন, তবে আপনাদের মতন ভূষি কি কারণে পুষি? [৯২]

লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে মিটিং ডাকার কারণ হল পুলিশ ও গুণ্ডারা মিলে লক্ষ্মণ পালিতের অঙ্গুলি হেলনে কমিউনিস্টদের এ পাড়া থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও জানা গেছে তাদের মধ্যে দু'জন, একজন হলেন স্বপন, অন্যজন হলেন মুস্তাফা গোপনে আবার এ পাড়ায় ঢুকেছে এবং মজুতদার লক্ষ্মণ পালিতের চালের গুদাম ভেঙে সমস্ত চাল লুঠ করে নিয়ে গেছে। এখন লক্ষ্মণ পালিতের অন্য গুদামগুলিতেও সঞ্চিত আটা, কেরোসিন ও বেবিফুড লুণ্ঠনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা স্বপন ও মুস্তাফা পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করে বলছে—

মজুতদার ও ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ পালিতের সহিত ছয় জন মন্ত্রী ও স্থানীয় কংগ্রেসি নেতারা এই চোরাকারবারে লিপ্ত। তাহারা বলিতেছে, মন্ত্রী নেতাগণ লক্ষ্মণ পালিতের নিকট হইতে মোট বাইশ লক্ষ টাকা ঘুষ খাইয়াছেন। [৯৩]

এই সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রী ও পুলিশ সহযোগে লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে।

এই সময় পুলিশি সন্ত্রাসের ভয়ংকরতা ও বীভৎসতা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। পুলিশ আইনের রক্ষক হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ পালিতের মতো জোতদারদের অঙ্গুলি হেলনে তাদেরকে চলতে বাধ্য করা হয়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুলিশকে তারা নিজের মতো করে ব্যবহার করে। পুলিশ প্রশাসন তার নিজের সত্তা হারিয়ে শাসক শ্রেণির আজ্ঞাবাহী দলদাসে পরিণত হয়। পুলিশি অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা কত বীভৎস হতে পারে তা তাদের কথোপকথন থেকেই স্পষ্ট হয়—

চিন্ময়।। দু-দিন আগেও তো রাজপথের মাঝখানে—

যেখানে-সেখানে—

এক-একজন ছেলেকে বিশজন পুলিশ বেষ্টনে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। বারাসাতে বারটি দেহ আপনাদেরই অসামান্য কীর্তি, ভুলবে না কেহ।...

মৃগাঙ্ক।। ... প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে দশদশটা মারকুটে নকশাল ছোকরাকে ওরা সেদিন লাঠি

দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। একটুও ঘাবড়ায়নি। তারপর ধরুন বেলগাছিয়ায়ায় পাঁচ-পাঁচটা খুনে ছোকরাকে ওরা মোটে তিনশ' জন গিয়ে গুলি করে মেরে এসেছে। তারপর টালিগঞ্জে দুটি সিপিএম-এর ছেলেকে ওরা মোটে দুশ' জন গিয়ে মেরে এসেছে।

লক্ষ্মণ।। তাছাড়া থানার মধ্যে অসীমা পোদ্দারকে মোটে চারজনে ধর্ষণ করেছে, একটুও ভয়

পায়নি।। [৯৪]

এইসময় পুলিশি নির্যাতনের পাশাপাশি জোতদার, মজুতদারি, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারির রমরমা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। একে তো পুলিশি অত্যাচার ও সন্ত্রাস সেই সঙ্গে জোতদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের লোভ। তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য এতটাই আকাশছোঁয়া হয়ে যায় যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা একপ্রকার অসাধ্য হয়ে ওঠে। আর এদিকে এই মুনাফা লাভের জন্য জোতদার মুনাফাবাজরা নানারকম রাজনৈতিক ফন্দি ও ছক তৈরি করেন।–

চিন্ময়।। মিস্টার পালিত, কিছু মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর স্বার্থে আপনার এই যে দেশদ্রোহিতা, দেশের চাল-আটা লুকিয়ে বড়বাজারের হাতে তুলে দেয়া—

লক্ষ্মণ।। দেশদ্রোহিতা? পশ্চিমবঙ্গ থাকবে রিক্ত নিঃস্ব এটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। পশ্চিমবঙ্গ জোগাবে ইস্পাত, কয়লা, লোহা, পাট, চা, এটা দিল্লীর পলিসি। আর আপনারা কলকাতায় সে-পলিসি কার্যকরী করবেন, তাই আপনাদের গদিতে বসানো হয়েছে। এখান থেকে সব কাঁচামাল নিয়ে যাব আমরা, শুষে নেব, লুঠে নেব— বাধা দিলে একটানে সরকারকে আবার ভুঁয়ে পাড়ব।

চিন্ময়।। না, মানে, শুনুন— যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যখন ভাঙা হল—

লক্ষ্মণ।। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন ভাঙা হল সেটা বাইরের লোকে না জানলেও, আপনার জানার কথা। কাঁচামাল লুণ্ঠনে তারা বাধা দিয়েছিল। দেশের শিল্প দেশেতে রাখিব আমরা তাহারে ছাড়িব না— এই ধরনের কথাবার্তা ছিল তার। শুনুন, ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু আয় ছিল ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। আমরা তাকে সাত নম্বরে নামিয়েছিলাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার দেশের সম্পদ দেশেই আটকে পশ্চিমবঙ্গকে আাবার পাঁচ নম্বরে তুলেছিল, আরো হয়ত তুলতো। এ স্পর্ধা আমরা সহ্য করিনি। চাকর চাকরের মতন থাকবে। পরাধীন পশ্চিমবঙ্গ কাঁচামাল জুগিয়ে যাবে— ভারত যেমন জোগাত ব্রিটেনকে। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করেছি। কাঁচামাল আবার বাইরে পাঠাচ্ছি, এবং শুনে হয়তো খুশী হবেন পশ্চিমবঙ্গকে এখন মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এগারো নম্বরে নামিয়েছি। আরো নামাবো। ভারতের সর্বনিম্ন স্থানে নামিয়ে তবে আমাদের ছুটি।। [৯৫]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসের তরফ থেকে নানারকম চক্রান্ত করে সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয়। লক্ষ্মণ পালিতের কথা থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ববৃন্দ তারা দেশটাকে শোষণ ও লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা তা চক্রান্ত করে ভেঙে দেয়। লক্ষ্মণ পালিতের কথা থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ ছিল। কংগ্রেস নেতারা শোষণ করে তাকে সাতে নামিয়ে এনেছিল। শেষপর্যন্ত শোষণ করতে করতে তা এগারো নম্বরে নামিয়ে এনেছে লক্ষ্মণ পালিতের মতো কিছু স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা। মাতৃসম পশ্চিমবঙ্গকে লক্ষ্মণ পালিতের মতো মজুতদাররা যখন নির্লজ্জভাবে শোষণ করে তখন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জের মতো মানুষেরা আকুল হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন— যে মাতৃসম পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো দরকার। জবাবে লক্ষ্মণ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেন—

পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশে আপনার এই বিষাদ কবে থেকে জাগল? লেক স্টেডিয়ামে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক উপন্যাসটা ছাপবার সময়ে কোথায় ছিল? কলকাতার রাজপথে মেয়েরা হাঁটতে গেলেই ধর্ষিতা হয়, এ খবর তো আপনিই ছেপেছিলেন? পুলিশ গিয়ে লোক খুন করে আর আপনি লেখেন—

নকশাল আর সি.পি.এম-এর ছেলেরা হত্যালীলায় মেতেছে! সারা ভারত সেসব গল্প পড়ে পশ্চিমবঙ্গকে ঘৃণা করতে শিখেছে, বলেছে, বাঙালি নরখাদক বনে গেছে। আপনারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, তাই আমরা বাঙালির টুঁটি চেপে ধরতে পেরেছি।– এই তো চলছিল সেদিন পর্যন্ত। [৯৬]

বাঙালির স্বপ্নের নগরী কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করতে লক্ষ্মণ পালিতের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষরা তো সর্বাগ্রেই ছিলেন, সেই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জের মতো মানুষরাও শাসকের তাঁবেদারি করে সদা সর্বদা নির্লজ্জভাবে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন। শাসক দলের অত্যাচারকে চাপা দিয়ে সর্বদা বিরোধী তথা কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনকে নির্লজ্জভাবে দোষারোপ করে গেছেন। সবসময় খুন, জখম, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতিকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন।

উৎপল দত্ত একের পর এক ঘটনাক্রম সাজিয়ে দেখাতে চেয়েছেন লক্ষ্মণ পালিতের মতো মজুতদার, শাসকশ্রেণির নেতা, পুলিশের বড়ো বড়ো অফিসার এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলো কীভাবে স্বপ্নের নগরী কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বানিয়েছিলেন। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে শোষণ-লুণ্ঠন করে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গকে নিঃস্ব রিক্ত করে তুলেছেন। তাই যখন পত্রিকা সম্পাদক বলেন—

গোবিন্দ।। তবু দেশ মানে মা-পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ক'রে [৯৭]

লক্ষ্মণ পালিতকে যখন একথা পত্রিকা সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জে বলেন, তখন লক্ষ্মণ পালিত প্রবল শ্লেষে ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেন—

শাটআপ! হেমন্ত বাবুকে খুন করলো এঁদের নিয়োজিত গুণ্ডা আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা চেঁচালেন, সি. পি. এম মেরেছে! দেশ নাকি মা! এই মাকে নগ্ন করে দিল্লীর দ্যুতসভায় কৌরব বিবরে করেছে সমর্পণ।

আজ কেন বিলাপ হে দুঃশাসন?

মায়ের বুকে ছুরি মারার এই প্ল্যান মজাদার।

আপনার আর আমার তাতে সমান অংশীদার।

সবাই আমরা বাংলা মায়ের কু-সন্তান,

সুতরাং হে সম্পাদক, হে পুলিশ, আর হে হেড-মস্তান,

কেন আর মেখে থিয়েটারি রং

এইসব সতীত্বের ঢং?

উই আর ইন দা সেম বোট, ব্রাদার! [৯৮]

চিন্ময় গোস্বামীর মতো কংগ্রেস নেতারা অথবা লক্ষ্মণ পালিতের মতো জোতদার শ্রেণির মানুষরা নিজ স্বার্থ কায়েম করতে অথবা শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বা জনতার বিরুদ্ধে গুণ্ডা, মস্তান, খুনিদেরকে ব্যবহার করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে এইসব গুণ্ডা পোষা মস্তান খুনিদের আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত করে। এইরকম একটা চরিত্র হল মণিভূষণ মিত্র। উৎপল দত্ত মণিভূষণ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ষাট-সত্তর দশকের কলকাতার শিক্ষিত বেকার যুবকরা শাসকশ্রেণির আজ্ঞাবাহী ভাড়াটে গুণ্ডায় পরিণত হওয়ার আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া। দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে শাসকশ্রেণির জাঁতাকলে পড়ে একজন শিক্ষিত বেকার ছেলে পেশাদার খুনিতে পরিণত হয়। শাসকশ্রেণির লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে এইসব খুনি মস্তানদের ব্যবহার করে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদেরকে নিকেশ করে ডাস্টবিনে ফেলতে একবারের জন্যও পিছুপা হন না। নাটকের শুরুতেই দেখি গ্যারেজ ঘরে বসে আছে মণিভূষণ মিত্র। অলস হাতে সে বোমায় দড়ি জড়িয়ে চলেছে। সিরাজ একজন পেশাদার খুনি যার ভয়ে কলকাতার বুকে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

মণিভূষণ রাজনৈতিক গুণ্ডা। খুন খারাপির এই পথে এলই বা কেন। কেউ তো আর জন্মগত অপরাধী হয় না। মণিভূষণ একজন শিক্ষিত দরিদ্র বেকার যুবক। সে একজন অধ্যাপক হতে চেয়েছিল। কিন্তু অনাত্মীয় শৈশব, শ্রদ্ধাহীন, ভালোবাসাহীন মূল্যবোধহীন এক দারিদ্র্য জর্জরিত পারিবারিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে মণিভূষণ তার নিজের ইচ্ছেটাকে ধরে রাখতে পারে না। অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন তার অধরাই থেকে যায়। চরম আর্থিক অনটনে অস্তিত্ব রক্ষার্থে দারিদ্র্য পীড়িত ক্ষুধার্ত বেকার যুবক ব্যাংক লুঠের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনাহারে মরতে চায়নি, তাই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—

> *আমি ব্যাঙ্ক লুঠ করি। বি-এ পাশ ক'রে বেকার হয়ে খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে মরার চেয়ে বাহুবলে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচব ভাবলাম। মনে হল গায়ে শক্তি থাকতে যে শালা স্থানুবৎ বসে ভাইবোনের ক্ষিদের কান্না শোনে, তার চেয়ে ঘৃণ্যজীব আর কেউ নেই। লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ— অনাহারে মরব কেন? লুঠ করে খাব! – ব্যাঙ্কে ঢুকে পিস্তল উঁচিয়ে টাকা কুড়িয়ে নিলাম দুহাতে।* [৯৯]

ব্যাংক লুঠের দায়ে মণিভূষণ ধরা পড়ে। শুরু হয় বেদম প্রহার। প্রহারের দাপটে এখনও তার মাথায় যন্ত্রণা হয়। সেসময় খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আকার ধারণ করে এবং তা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের এই খাদ্য আন্দোলন দুর্বার গতিতে এবং

অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। এই আন্দোলনের তীব্রতায় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার একপ্রকার দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ঠিক সেইসময় চিন্ময় গোস্বামীর মতো কংগ্রেসি নেতা অথবা লক্ষ্মণ পালিতের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, মুনাফালোভী জোতদারদের পাল্লায় পড়ে মণিভূষণ মিত্র। তারা মণিভূষণ মিত্রকে ব্যবহার করে। তারা মণিভূষণের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় কমিউনিস্টকে হত্যা করলে তারা ব্যাংক ডাকাতির কেস থেকে রেহাই দেবে। কিন্তু কেস থেকে রেহাই দেওয়া তো দূরস্থ তারা ক্রমাগত একটার পর একটা কেসে তাকে জড়িয়ে একটার পর একটা খুন করতে বাধ্য করে তাকে একজন পেশাদার গুণ্ডা ও বিশ্বস্ত খুনিতে পরিণত করে। মণি মিত্রর কথায়—

> *তারপর একদিন বন্দুক হাতে দিয়ে বলে কমিউনিস্ট মার, তবে ডাকাতির দায় থেকে রেহাই দেব। মাথার ভেতর তখন— কি বলব— দে ড্রোভ মি ম্যাড, পাগল হয়ে গেছি ততক্ষণে। চিন্তার শক্তি নেই। মারলাম একটি ছেলেকে। তখন বলে, আরেকটি ছেলেকে মারতে হবে, নইলে প্রথম ছেলেটিকে খুনের দায়ে আমায় ফাঁসি দেবে। এইভাবে চলল। তৃতীয়কে না মারলে দ্বিতীয়কে খুনের চার্জ— চতুর্থকে না মারলে, তৃতীয়কে খুনের চার্জ! মাথার ভেতরে মগজটা বোধহয় গলে গেছে।– শয়তানরা! মেরে, ওষুধ খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়ে আমাকে একটা রাজানৈতিক অস্ত্র বানিয়েছে।* [১০০]

মণিভূষণ মিত্র এখন শাসক গোষ্ঠীর বিশ্বস্ত খুনি। একটার পর একটা রাজনৈতিক খুন করে সে এখন জনতার কাছে আতঙ্ক। সে মানুষ খুন করতে যেমন পারদর্শী তেমনি বোমা ছুঁড়তেও সমভাবে পারদর্শী। সে লক্ষ্মণ পালিত, মৃগাঙ্ক রায় ও চিন্ময় গোস্বামীর মতো মানুষদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের আজ্ঞাবাহী দাসের মতো কাজ করে। বোমা মারতে বললে বোমা মারে, খুন করতে বললে খুন করে। তাদের আজ্ঞা পালন করতে তাকে একটার পর একটা কমিউনিস্টকে হত্যা করতে হয়েছে বা হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন রকম ভয়-ভীতি দেখিয়ে এই কাজ করাতে মণিভূষণকে বাধ্য করে—

> *মণি।। এসব— এসব কী?*
>
> *লক্ষ্মণ।। তোমার পারিশ্রমিক। কাল রাত্রে তুমি পাড়ায় ঢুকে চেঁচবে মাও-ৎসে-তুং যুগ যুগ জিও। বলেই এক কনস্টেব্‌লকে ছুরি মারবে। পরশু রাত্রে তুমি পাড়ায় ঢুকেই চেঁচাবে জোতি বসু জিন্দাবাদ, বলেই তুমি কংগ্রেস আপিসে বোমা মারবে। এতে টি টি পড়ে যাবে— নকশাল আর সি.পি.এম আবার খুনোখুনি করছে। তখন তুমি আবার পাড়ায় ঢুকে নকশাল বাড়ি লাল সেলাম চেঁচাতে চেঁচাতে*

স্বপনকে খুন করবে। [১০১]

একজন পুলিশ কনস্টেবলকে ছুরি মারতে হবে, সেটা একজন পুলিশ কর্তার মদতেই হচ্ছে। তাতে তার কোনো আপত্তি নেই, কারণ পুলিশের কনস্টেবল নিমাই মোদক যে একজন পুলিশ ইউনিয়নের সম্পাদক। মৃগাঙ্ক রায়ের মতো বা লক্ষ্মণ পালিতের মতো মানুষের কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই পুলিশ কনস্টেবল নিমাই মোদক। তাই তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে পুলিশেরই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মৃগাঙ্ক রায়। আবার কংগ্রেস অফিসেও বোমা মারার কথা বলা হয় কারণ ওখানে সেইসময় উপস্থিত থাকবেন দিব্যেন্দু চক্কোত্তি নামে একজন কংগ্রেস-এর কর্মী। কিন্তু এই চিন্ময় গোস্বামীর শত্রু সে। তাই নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য চিন্ময় গোস্বামী তারই পার্টির সহকর্মী দিব্যেন্দু চক্কোত্তিকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এবং তারা সেই কাজটা মণিভূষণকে দিয়েই সমাধা করতে চায়।

মণিভূষণের মতো শিক্ষিত বেকার ছেলেদের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত পশ্চিমবঙ্গের আপামর বেকার শিক্ষিত যুবকদের জীবনের ছবিটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অনেক শিক্ষিত বেকাররা কাজ না পেয়ে, চাকরি না পেয়ে তারা তাদের আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত হয়েছে। ভুল পথে চালিত হয়েছে। তাদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে শাসকদল তাদেরকে ব্যবহার করেছে, তাদেরকে পেশাদার গুণ্ডায় পরিণত করেছে। চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে যাবতীয় অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছে। কখনো কখনো চাকরি দেওয়ার নাম করে তারা কমিউনিস্টদের উপরে বেকার যুবকদের দ্বারা আক্রমণ করিয়েছে। অথচ চাকরিটা নানান অছিলায় তারা তাদের দেয়নি। শেষপর্যন্ত তাদেরকে আসামী বানিয়েছে। মণিভূষণের উক্তির থেকে এই অত্যাচার, তাদেরকে গুণ্ডা বানানোর যে বিভিন্ন পন্থা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

> *তারপর এসে বললেন, সি.পি.এম-কে মেরে পাড়া ছাড়া করতে হবে— তাহলে চাকরি দেবেন। পুলিশ পাহারায় দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছে। এ পাড়ায় সি.পি.এম-এর শান্তনু রায় মরেছে, জীবনকৃষ্ণ, সুরেন, জসীম, গণেশ— নকশাল ছেলে অনুপম সরকার, ভয় কাকে বলে জানে না—। কিন্তু চাকরি পাইনি। তখন বললেন, নির্বাচনটা পার করতে হবে। তাহলে গদিতে বসেই সক্কলকে চাকরি দেবেন। আমার ছেলেরা তাই মেনে নিয়ে গুণ্ডামি আর জোচ্চুরিতে নামল। বিপক্ষের ইলেকশন এজেন্টকে গুম করেছি, ব্যালট বাক্স পাল্টে দিয়েছি, ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ না আসতে পারে তারই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছি, বোমা মেরে ভোট কেন্দ্র তছনছ করেছি, হাজারে হাজারে জাল ভোটপত্রে ছাপ মেরে বাক্সে ফেলেছি। (চিৎকার ক'র) কিন্তু চাকরি পাইনি— ক্ষুধার জ্বালায় তবু জ্বলছি!* [১০২]

এসব কৃতকর্মের জন্য মণিভূষণের আত্ম-অনুশোচনা হয়। সে শোষকদের স্বরূপ জেনে ফেলেছে। তারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই তাদেরকে এই অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে এসেছে। সে শোষকদের এই চক্রব্যুহ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু আসতে পারে না। সে আর মানুষ খুন করতে চাইছে না, একটার পর একটা হত্যা ও তার বীভৎসতায় সে একেবারে দিশেহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সে আর পাঁচটা মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাইছে। কিন্তু সে শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কোনোভাবেই। তবু তাকে খুন করে যেতে হবে কেননা লোভী, অত্যাচারী, শোষকদের ফাঁদে সে বন্দি। মণিভূষণকে একটার পর একটা খুন করে যেতে হয় তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নিজের বিবেক ও নিজের জীবন দৃষ্টির বিরুদ্ধে। সে যখন টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করতে অস্বীকার করে, একটা সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে আগ্রহী হয় তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই স্বার্থপর লোভী শাসকের একাংশ। তারা মণিভূষণকে নানারকমভাবে ভীতি প্রদর্শন করে। তারা মণিভূষণকে দিয়ে মার্ডার করায় আবার যখন মণিভূষণ এসব ছেড়ে সুন্দর জীবনের পথে অগ্রসর হতে চায় তখন তারাই সেই মার্ডারের কেসে তাকে অ্যারেস্ট করার হুমকি দেয় ও তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ভীতি প্রদর্শন করে।—

মণি।। আমি এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাব। আমি... আমি অন্যভাবে বাঁচতে চাই। এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে?

লক্ষ্মণ।। ও, তুমি এ পথ ত্যাগ করবে ভাবছ? সেটা কি করে সম্ভব হবে? পাড়া বদলে স্বপনদের হাত এড়াতে পার, কিন্তু পুলিশের হাত এড়াবে কি ক'রে?

মণি।। পুলিশ? পুলিশ কী করবে?

মৃগাঙ্ক।। তোমার বিরুদ্ধে চারটে মার্ডার কেস রয়েছে মণিভূষণ। তোমাকে এরেস্ট করা হবে, মামলা চালু হবে।

চিন্ময়।। মামলাগুলো আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি, মণিদা।

লক্ষ্মণ।। বদন, তুমি কি ফাঁসিতে ঝুলতে চাও?

মণি।। আমরা খুন করেছি আপনাদের হুকুমে।

লক্ষ্মণ।। সেটা আদালতে গ্রাহ্য কোনো যুক্তিই নয়, বদন। মামলা চালু করলে তুমি ফাঁসিতে ঝুলবেই।

মণি।। তার মানে— তার মানে অন্তহীন এই বৃত্ত?

চিন্ময়।। বটেই তো। অন্য যত মস্তান আছে আমাদের হাতের মুঠোয়, প্রত্যেকে এই ভয়েই তো আমাদের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে মুখ বুজে।[১০৩]

এভাবে মণিভূষণ এক বিরাট রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এই ষড়যন্ত্র থেকে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। সত্তরের দশকে কংগ্রেস সরকার শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এইরকম অন্ধকার জগতে টেনে আনে। তারই এক বাস্তব চিত্র উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন মণিভূষণ মিত্র চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

উৎপল দত্ত সত্তর দশকের প্রথমার্ধে কলকাতার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সংগঠিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেছেন। তার ব্যাখ্যা ও অন্তর্তদন্ত করেছেন। তৎকালীন কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকে তিনি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করেছেন। শাসকের সঙ্গে মণিভূষণের দ্বন্দ্ব সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট সন্ত্রাসের বহুবিধ ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। দেখিয়েছেন শাসক দলের গুণ্ডা ও মস্তানরা পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্টদের খুঁজে বার করে তাদেরকে প্রহার করা, তাদেরকে পাড়া ছাড়া করে দিত যাতে তারা শাসকের বিরুদ্ধে কোনোরকমভাবে মুখ খুলতে না পারে, সংগঠনে নামতে না পারে। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করা হত। পাড়ায় পাড়ায় নিরীহ নাগরিকদের উপরে হামলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে একটা ভয়ার্ত পরিবেশ সদাসর্বদা জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা তারা করে যেত।

এর পরে আমরা দেখি, গোপন মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় মণিভূষণ মিত্র কমিউনিস্ট নেতা স্বপনকে হত্যা করবেন। তার পরিবর্তে মণিভূষণের বিরুদ্ধে যত মার্ডার কেস আছে, যত ফাইল আছে সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই অন্ধকার জগৎ থেকে নিষ্ক্রমণের রাস্তা খুঁজতে থাকে মণিভূষণ। মণিভূষণ স্বপনকে হত্যা করার জন্য দশ হাজার টাকার চুক্তি হয় এবং আগাম সাত হাজার টাকা ক্যাশ। কিন্তু মণিভূষণ স্বপনকে খুন করতে গিয়ে খুন তো করেন না, উলটে স্বপনকে হাতের কাছে পেয়েও তাকে ছেড়ে দেয়, এমনকি তাকে পালাতে সাহায্য করে। শাসক দল চক্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্ধকার জগতের যে আস্তাকুঁড় ওরা বানিয়ে রেখেছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে মণিভূষণ মিত্র। এই পথ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এতটা সহজ নয়, তবুও সে সৎ পথের, সুন্দর জীবনযাপন করার আশায় এপথ থেকে বেরোনোর জন্য লক্ষ্মণ পালিত, মৃগাঙ্ক রায় প্রভৃতি শঠ মানুষদের বিরুদ্ধে সে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ধূরন্ধর, শঠ, স্বার্থপর এই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মণিভূষণ মিত্রের বিদ্রোহ চরমে ওঠে যখন তার প্রেমিকা পূর্ণিমা, যিনি লক্ষ্মণ পালিতের টেলিফোন অপারেটর ছিল, তাকে পুলিশ যখন

গ্রেফতার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, পূর্ণিমা টেলিফোনে আড়ি পেতে শাসক দলের সমস্ত চক্রান্তের গোপন খবর জানিয়ে দিতেন কমিউনিস্টদের। পূর্ণিমাকে গ্রেফতার করার পর তার উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। এই খবরে মণিভূষণ আরো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং শাসকশ্রেণির এই স্বার্থপর কূট শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। সে শাসকদের সমস্ত চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয়—

মণি।। শাটআপ। আমি বলছি শুনুন— পূর্ণিমাকে আজকের মধ্যে ছেড়ে না দিলে আমি সব ফাঁস করে দেব।

লক্ষ্মণ।। কী বদন? তুমি কী ফাঁস করে দেবে?

মণি।। সব। কি ক'রে একটা মজুতদারের ঘুষ খেয়ে এই নেতা, এই পুলিশ— কনস্টেব্‌লকে কে খুন করেছে— দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে কে মেরেছে— অন্ধ পল্লবকে কি ক'রে পুলিশের সামনে খুন করা হয়েছে সব বলতে শুরু করব, মহাশয়গণ!

চিন্ময়।। এ অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।

মণি।। শালা আজ বিকেলের মধ্যে যদি পূর্ণিমা বাড়ি না ফেরে তবে কেলেঙ্কারি ফাঁস হবে। এবং সে কেলেঙ্কারি আরো বহুদূর গড়াবে, বাবুরা! এটা ফাঁস হলেই লোকে হেমন্ত বসুর খুনের ব্যাপারটা বুঝবে, জজ আর উপাচার্য খুন হবার রহস্যটা ধরে ফেলবে। আরো ডজন ডজন হত্যাকাণ্ডের নায়করা ধরা পড়ে যাবেন! কলকাতাকে যে আপনারাই দুঃস্বপ্নের নগরী ক'রে তুলে নকশাল আর সি.পি.এম-কে নন্দ ঘোষ বানিয়ে শেষ করে দিতে চাইছিলেন, এসব লোকেরা বুঝে ফেলবে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন, স্যারেরা! হাঃ হাঃ!।[১০৪]

মণিভূষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শাসকগোষ্ঠী কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে গোপন মিটিং হয় এবং সেই গোপন মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে কোনো উপায়ে মণিভূষণকে খতম করে দিতে হবে। কারণ, সে অনেকটা বেশি জেনে ফেলেছে।

এরপরে আমরা দেখতে পাই নাটকের সবচেয়ে বড়ো ক্লাইম্যাক্স। শাসকদল পুর্ণিমাকে মুক্তি দেয়নি, তাকে নানারকমভাবে অত্যাচার ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ক্রুদ্ধ মণিভূষণ শাসকের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ায়। সে শাসকদের দলবলের সমস্ত কেলেঙ্কারি ও কুকীর্তি বিস্তারিতভাবে লিখে সেটা খামে ভরে অপেক্ষা করছে এক বামপন্থী পত্রিকার সাংবাদিকের জন্য। সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি শাসকদলের এই নেতা, পুলিশ ও জোতদারদের সমস্ত কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিতে চায়। তার জন্য গভীর রাত্রে কলকাতার এক

নির্জন পথের ধারে অপেক্ষা করছে মণিভূষণ মিত্র ও তার সাকরেদ সাগর। এই সাগর মনিভূষণ মিত্রকে গুরু বলে মানে। অনেক অপেক্ষা করার পরও কোনও সাংবাদিক আসে না। পরিবর্তে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকাটাকে ঘিরে ফেলে সশস্ত্র পুলিশ। মণিভূষণের বুঝতে বাকি থাকে না তার এই আজ্ঞাবাহী সাকরেদ সাগরই তাকে ঠকিয়েছে। সেই পুলিশকে খবর দিয়েছে। সেকথা তার সাকরেদ সাগর স্বীকারও করে।—

মণি।। এমনিই ধরিয়ে দিলি?

সাগর।। নইলে আমায় ফাঁসি দেবে গুরু? তুমি তো স্বপনকে মারবে বলেছিলে? নিজের জান বাঁচাতে তুমি তো স্বপনকে মারবে বলেছিলে; আমিও নিজের জান বাঁচাতে— গুরু! [১০৫]

সশস্ত্র পুলিশের বূহ্যে আটকে পড়ে মণিভূষণ। একদিকে মণিভূষণ একা, আর একদিকে গোটা রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র ও বিশাল পুলিশবাহিনী। সে চেয়েছিল অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে। সে চেয়েছিল শাসকের চক্রান্ত, কর্দমময় আস্তাকুঁড়ে থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কিন্তু তার মুক্তি আর মেলে না। তার মুক্তি মেলে চিরকালের জন্য। পুলিশের কর্তা মৃগাঙ্ক রায় বড়ো সার্ভিস পিস্তল থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করে—

মৃগাঙ্ক।। দেখি বড় সার্ভিস পিস্তল একটা। মণিভূষণ বাড়ি যাও। তোমার ফাইল পুড়িয়ে দিয়েছি। তাই মামলা তো আর চালাতে পারব না। কাজেই তুমি রিলীজ্‌ড্‌।

[মণিভূষণ দৌড়ে পালাতেই মৃগাঙ্ক পিছন থেকে গুলি করে এবং মণিভূষণ ডাস্টবিনে পড়ে যায়]। [১০৬]

উৎপল দত্ত 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটির মধ্যে দিয়ে সত্তর দশকের সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন শাসকের জাঁতাকলে, তাদের ষড়যন্ত্রে মণিভূষণের মতো শত সহস্র ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। মণিভূষণ একটি প্রতীকী চরিত্রমাত্র। মণিভূষণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত শত শত বাঙালি যুবকদের কথাই বলতে চেয়েছেন যারা সদা সর্বদা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অন্ধকার পথ বেছে নেয়। যে পথ থেকে ফেরার আর কোনো রাস্তা থাকে না শেষপর্যন্ত মণিভূষণের মতো মৃত্যু বরণই করতে হয়। ইতিহাসের একটা চক্রান্ত ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের বলি হয় মণিভূষণের মতো মানুষেরা।

নাটকের শেষে দেখি জনতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা স্বপন ও মুস্তাফারা, সঙ্গে শ্রমিকের দল। উদ্যত জনতার মিছিল এগিয়ে আসে শেষ প্রতিরোধের জন্য। শাসকের অত্যাচার-অন্যায়, অবিচার প্রভৃতিকে রুখে দেওয়ার জন্য। চায়ের দোকানের প্রৌঢ় যে ভদ্রলোক কৃষ্ণচূড়া তাকে মারতে মারতে নিয়ে চলেছিল কংগ্রেসি খুনি মস্তান গিরিন ও তার

দলবল। স্বপন ও মুস্তাফারের নেতৃত্বে শ্রমিক জনতা যখন সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সেই প্রতিরোধে তারা কিন্তু পালিয়ে গেছে। পাড়া ছেড়ে সব পালিয়ে গেছে, মিছিল দেখে সব হাওয়া হয়ে গেছে। শেষ অংশটির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত কমিউনিস্টদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, তাদের সংগঠিত হওয়ার বার্তা সুকৌশলে প্রয়োগ করেছেন।

সমকালীন এই নাটক যেমন সাড়া জাগিয়েছিল মানুষের মধ্যে তেমনি পরবর্তীকালেও এই নাটক একটা দেশ-কাল-জাতির জ্বলন্ত দলিলরূপে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। এই নাটক সেই সময় শাসকদলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শাসক দলের কাছে এই নাটক অবশ্যই নিন্দিত। কিন্তু অত্যাচারী এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই নাটক সদা সর্বদা স্মরণযোগ্য। কারণ এই নাটক দেখিয়ে দেয় মুক্তির জন্য মানুষ কীভাবে সংগ্রামী হয়ে ওঠে, শাসকদলের অন্যায় অত্যাচার কীভাবে মানুষকে জোটবদ্ধ করে তোলে। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি জনমানসে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল এবং সরকারের নির্যাতনের মুখোশটি উন্মোচিত করায় এ নাটক গোড়া থেকেই শাসক শ্রেণির ভাড়াটে গুণ্ডার দ্বারা বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে, এমনকি এই নাটক বন্ধ করার জন্য এই নাটকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *আমাদের দুঃস্বপ্নের নগরী— তখন বে-আইনী হলো, শুধু বে-আইনী হলো না, প্রহৃতও হলো; যেখানেই অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।*[১০৭]

উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের নগ্ন চিত্র জনসম্মুখে উন্মোচন করলেন। পুলিশ, গুণ্ডা, মস্তান প্রভৃতি সবার মুখোশের আড়ালে তাদের আসল রূপকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিলেন। তাই শাসক, পুলিশ ও জোতদার শ্রেণি বিষয়টিকে যে ভালোভাবে মেনে নেবেন না তা উৎপল দত্ত আগে থেকেই জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতায় এ নাটক আক্রান্ত হবেই। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' প্রথম আক্রান্ত হয় উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারে, ২৬ আগস্ট ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাটির বিবরণ দিতে গিয়ে উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> *স্টার থিয়েটারে সেদিন পাঠানো হয়েছিল উত্তর কলকাতার কুখ্যাত দুষ্কৃতিদের। সশস্ত্র এই দুষ্কৃতিরা দুপুরের দিকে ঢুকে পড়ে থিয়েটারের মধ্যে। সেখানে তখন নাটকের স্টেজ-কর্মীরা সেট তৈরি করছিল। ইন্দিরা-গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ঐ কুখ্যাত গুণ্ডারা স্টেজ-কর্মীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করলো, নাটকের সেট ভেঙে দিল এবং সেটের কিছু অংশে আগুন লাগিয়ে দিল। এরপর তারা হলের সব*

ক'টি দরজা অবরোধ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো আমাদের জন্য। বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি যখন হলে পৌঁছলাম তখন একদল লোকের উন্মত্ত চিৎকার কানে এল— 'দূর হঠো! দূর হঠো! এই গুণ্ডাদের পাহারা দিচ্ছিল বিরাট সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ। আমি এই গুণ্ডাদের পাশ কাটিয়ে হলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করা মাত্র ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুষি মেরে রাস্তায় ফেলে দিল। আমি দেখলাম আলোকশিল্পী তাপস সেনকেও ওরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আমাদের অভিনেত্রী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওরা চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে দিল। ঐ এলাকার কিছু মানুষজন এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় সশস্ত্র পুলিশের দল, যারা এতক্ষণ উদাসীন ছিল, সহসা ঐ মানুষগুলোকে রাইফেলের বাট দিয়ে পেটাতে শুরু করল। [১০৮]

'দুঃস্বপ্নের নগরী' তৎকালীন জনমানসে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল, কলকাতার মানুষ এতটাই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে এই নাটককে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। তখন কলকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিভূতি চক্রবর্তী উৎপল দত্তের নামে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলার ধারাটি ছিল ১২৪এ। এই ধারা অনুযায়ী শাস্তি ছিল সর্বাধিক পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম তার কবিতার জন্য তিনিও এই ধারায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারপরে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে এই ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলা করে নাটকটিকে কার্যত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কোনোভাবেই যেন অভিনীত না হয় তার জন্য তারা সবপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অভিনয় হত, অভিনয় থামেনি। অন্য নামে অভিনয় হত। সে কথা উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

কিন্তু নাটকটা কার্যত 'ব্যানড' হয়ে গেছিল। তা বলে থামেনি। অভিনয় হত। অন্য নামে। 'কলকাতার কড়চা', কত রকম নাম। পশ্চিমবঙ্গে বহু জায়গায় অভিনয় হয়ে গেল। শুধু নামটা পাল্টে দিত স্থানীয় কমরেডরা। [১০৯]

'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি সমকালীন রাজনীতিতে বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে উথাল-পাথাল করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। নাটকের সমকালীন রাজনীতিকে তুলে ধরে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি বাংলা থিয়েটারের অন্যতম সেরা দলিল হয়ে উঠেছে।

এবার রাজার পালা

প্রথম অভিনয় : ৬ জানুয়ারি ১৯৭৭, কলামন্দির

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থাকারে, জুন ১৯৭৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৫ সালে ১৫ জুন ভারতব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি হয়। উৎপল দত্ত এই জরুরি অবস্থার পটভূমিকায় রচনা করলেন 'এবার রাজার পালা' নাটকটি। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-শোষণে, গর্জনে ও তর্জনে দেশময় তখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেশব্যাপী বিভিন্ন বিরোধী পক্ষের মিটিং মিছিল বন্ধ করে দেওয়া, বিরোধী পক্ষের সমস্তরকম স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করে নেওয়া থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের ওপরে সেন্সরশিপ বসানো কোনো কিছুই বাদ ছিল না। মানুষের গণতান্ত্রিক সকল রকমের অধিকার সেদিন এই জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সির পটভূমিকায় পুলিশ ও গুণ্ডাদের সন্ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করে তার পরিবর্তন করা, অবাঞ্ছিত আইন প্রণয়ন করা কিছুই বাদ ছিল না। বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠকে বিনা অপরাধে, বিনা কারণে কারাগারে বন্দি নইলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি, তারই স্নেহধন্য পুত্র সঞ্জয় গান্ধির রাজনীতিতে আবির্ভাব। এই এমারজেন্সির সুযোগে সঞ্জয় গান্ধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় পুলিশকে ব্যবহার করে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন দেশের রাজনীতিতে। সব মিলিয়ে সে এক ভয়ংকর অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে। উৎপল দত্ত তাঁর 'এবার রাজার পালা' নাটকটিতে এই ভয়ংকর বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থাকে সুন্দরভাবে তাঁর নাটকটিতে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বৈরাচারী শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন।

'এবার রাজার পালা' নাটকটি উত্তরবঙ্গের একটি কাল্পনিক সামন্ত রাজ্যের কল্পনায় স্থাপন করা হয়েছে। সামন্ত রাজ্যটির নাম 'মেচগীর'। এই কল্পিত সামন্ত রাজ্য মেচগীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই নাটকের বিষয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। নাটকের ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের কল্পিত সামন্তরাজ্য 'মেচগীর' যেন ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কল্পিত সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর'-এর রাজা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুর স্বৈরাচারী মানসিকতা, ক্ষমতা দখল করার নির্লজ্জ আপ্রাণ চেষ্টা, বিরোধী কণ্ঠকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও সংবিধানকে তছনছ করার চেষ্টা তা লক্ষ করা গিয়েছিল ১৯৭৭-এর রাজনৈতিক ইতিহাসে। ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধি একই রকমভাবে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যায়। নির্বিচারে কমিউনিস্টদের

উৎখাত করার প্রচেষ্টা তাঁরা করতে থাকেন। বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠ— তাদেরকে নির্বিচারে কারাগারে বন্দি করতে থাকেন। মিথ্যা গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র শাসনকে তাঁরা কায়েম করেন। ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর চক্র ভারতের সংবিধানকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করলেন। ভারতবাসীর সব গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেন, সব বিরোধী রাজনীতিকদের নির্বিচারে জেলে পাঠালেন গণতন্ত্র রক্ষা করার নামে। সেই নির্লজ্জ ক্ষমতালোভের প্রচেষ্টাকে উৎপল দত্ত কাল্পনিক সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর'-এর রাজা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুর মধ্য দিয়ে অতীব সুন্দরভাবে হাস্যরসাত্মকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বৈরাচারী এক নায়কের উত্থান-পতন এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন হল 'এবার রাজার পালা' নাটকের মুখ্য বিষয়। আমরা 'এবার রাজার পালা'ই নাটকে সম্যক আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হব এবং দেখার চেষ্টা করব উত্তরবঙ্গের একটি সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর' ও তাঁর রাজা বঙ্কুর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা।

নাটকে ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ব্রিটিশ অধিকৃত উত্তরবাংলার 'মেচগীর' নামক এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের এক গ্রামে রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের আমন্ত্রণে সেখানে যাত্রাপালা নিয়ে পালা করতে এসেছে ননী অধিকারীর দল নামে পরিচিত একটি যাত্রার দল। মেচগীর হল একটি সামন্ত রাজ্য। সেখানকার রাজা টিকেন্দ্র জিৎ। টিকেন্দ্র জিৎ-এর ভাই হলেন রাজকুমার ত্রিদিব সিংহ। নাটকের শুরুতে দেখা যায় দুদিন ধরে অভুক্ত থাকা অবস্থায় ননী অধিকারীর এই দলটি 'কংসবধ'-এর মহলা দিচ্ছে পূর্ণ সাজসজ্জা নিয়ে। ননী অধিকারীর দলটি অত্যন্ত দরিদ্র। এই দলের প্রধান অভিনেতা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু। বঙ্কু দলের বাঁধা রাজা। দলের প্রধান গায়ক চন্দ্রশেখর ডোম, আর এক অভিনেতা হলে ঝগড়ু নাপিত। ননী অধিকারী হলেন এই দলের মালিক ও পালা রচয়িতা। দলের প্রধান গায়ক চন্দ্রশেখর ডোমের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই এই দলটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে দশ বছর ধরে সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে নানা রকম পালা গেয়ে ব্রিটিশ অপশাসন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছে। এই মেচগীর নামক সামন্ত রাজ্যে প্রবল খাদ্যাভাব, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ দুবেলা দু-মুঠো অন্ন সংস্থান করতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ বটের পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে। বঙ্কু, চন্দ্রশেখর ডোম অথবা বঙ্কুর রক্ষিতা যমুনার কথোপকথনে এই রাজ্যের প্রবল খাদ্যাভাবের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়—

বঙ্কু।। আমার অসম্ভব খিদে পেয়েছে। সেই পরশুদিন খানিক খিচুরি খেতে দিয়েছে। তোমার ভাষা ওগরাতে হলে পালোয়ানের শক্তি লাগে ননীদা।

চন্দ্র।। হ্যাঁ বটে। জমিদার বাবু হাত উপুড় করছেন না কেন? আমরা কি খালি পেটে পালা গাইব?

ননী।। কাল বাদে পরশু পালাগান হবে, তখন খেতে দেবে।

যমুনা।। এ গাঁয়ে কেউই খেতে পাচ্ছে না, বটের পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে। [১১০]

—ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ পরাধীন। এই পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্ত সমকালীন অর্থাৎ ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ বিরোধিতার কাহিনির মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালীন ভারতবর্ষের শাসকের বিরুদ্ধে একপ্রকার জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

বঙ্কু হল সামন্ত রাজ্য মেচগীর-এর রাজা টিকেন্দ্রজিৎ-এর অবৈধ সন্তান। বঙ্কু সেকথা গর্বের সঙ্গে প্রচার করে—

আমি রাজা টিকেন্দ্রজিতের জারজ ছেলে... কলকাতার বাড়িতে আমার মাকে দাসী রেখে ছিল, রাজা। রাজা টিকেন্দ্রজিতের ঔরসে ঐ দাসীর গর্ভে আমার জন্ম। [১১১]

নাটকের মহলা চলাকালীন নানা ঘটনাও ঘটে। বঙ্কু খালি পেটে কংসের গুরুগম্ভীর সংলাপ বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে যায়। ঝগড়ু নাপিত উন্মত্ত হয়ে চিৎকার শুরু করে পূর্ণিমা পড়লেই তার মাথায় ভর হয়, সে নিজের সঙ্গে তর্ক শুরু করে। এর ফাঁকে বঙ্কু আর যমুনার প্রেমালাপ চলতে থাকে। এইরকম পরিবেশে রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের পুলিশের তাড়া খেয়ে কমিউনিস্ট এবং কৃষকের নেতা ভীষ্মলোচন দাস এবং তার স্ত্রী আন্নাকালী পালিয়ে এসে হাজির হয় যাত্রাদলের মহড়া কক্ষে, আশ্রয়ের আশায়। ভীষ্মলোচন আলিপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরেছে চারদিন আগে। জমিদার ত্রিদিব সিংহ তাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছে, কারণ সে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষিদের সঙ্গে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই যাত্রার দল ত্রিদিব সিংহ এনেছেন, তাই তারা ভীষ্মকে কেউই আশ্রয় দিতে রাজি হয় না। সবাই এক উটকো ঝামেলার মধ্যে পড়ে। শেষে দলের অভিনেতা বঙ্কু এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে, বঙ্কুর ইচ্ছায় ভীষ্মলোচন ও তার স্ত্রী আন্নাকালী আশ্রয় পায়। ভীষ্মের খোঁজে বন্দুক হাতে রাজার খুড়তুতো ভাই জমিদার ত্রিদিব সিংহ প্রবেশ করে, সঙ্গে তার সশস্ত্র সেবক মস্তান ট্যাংরাও প্রবেশ করে।

মহড়া কক্ষে ত্রিদিব সিংহ ভীষ্মলোচনকে না পেয়ে তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যাত্রা দলের নায়িকা তথা বঙ্কুর প্রেমিকা যমুনার দিকে। যমুনার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে এক থলি টাকা দিয়ে নিজের রক্ষিতা করে নেন। যমুনাও ভেবে-চিন্তে বঙ্কুকে ছেড়ে ত্রিদিব সিংহের সঙ্গিনী হয়ে যায়। বঙ্কু এর প্রতিবাদ জানালে ত্রিদিব সিংহের হুকুমে তার সাকরেদ ট্যাংরা বঙ্কুকে চাবুক পেটা করে। এরকম পরিস্থিতিতে রাজ্যের দেওয়ান হরকিশোর রায় স্বপারিষদ প্রবেশ করে জানায় যে রাজ্যের রাজা টিকেন্দ্রজিৎ পোলো খেলতে গিয়ে আহত হয়ে মারা গিয়েছেন। তখন ত্রিদিব সিংহ

নিজে রাজা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে, কিন্তু দেওয়ান হরকিশোর রায় জানায় ত্রিদিব সিংহ রাজা হতে পারবে না। কারণ সারা হিন্দুস্থানে রাজার আটত্রিশ জন জারজ ছেলে রয়েছেন, তাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলেন বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু। সমস্ত প্রমাণাদি দেখার পর এবং মেচগীরের নিয়ম অনুযায়ী বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুকে দেওয়ান হরকিশোর মেচগীরের স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। যাত্রার রাজা থেকে বঙ্কু সত্যিকারের রাজায় পরিণত হয়।

যাত্রাপালার রাজা বঙ্কু এখন সত্যিকারের রাজা। দেওয়ান হরকিশোর ভেবেছিল, এই অশিক্ষিত, অমার্জিত, অজ্ঞ লোকটাকে রাজা বানিয়ে বকলমে নিজের মতো করে রাজত্ব চালাবেন। কিন্তু তার সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। নতুন আইন জারি করে বঙ্গেশ্বর সিংহ জমিদারি প্রথা বিলোপ করে দেন। তার হুকুমে কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে বন্দি করে এনে ভুগর্ভস্থ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। কপুর থালার রাজকুমারীর সঙ্গে এ রাজ্যের রাজার ঐতিহ্যমাফিক যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রথা সেটাকে বাতিল করে মহারাজ বঙ্কু তার পূর্বতন রক্ষিতা যমুনাকে ত্রিদিব সিংহের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে মহারানী বানায়। রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয়ভাজন ননী অধিকারী, ঝগড়ু নাপিত ও চন্দ্র ডোমকে তার পারিষদে নিয়োগ করে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত বঙ্কু ননী অধিকারীর লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে রাজ্য জুড়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। মহারাজা বঙ্কুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সে ক্রমশ ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠেন এবং সর্বক্ষমতা আপন কুক্ষিগত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। সে ক্রমাগত স্বৈরাচারী, নির্মম এক শাসক-এ পরিণত হয়।

সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণির সঙ্গে মহারাজা বঙ্কুর বিবাদ শুরু হয়। নতুন রাজা বঙ্কুর পূর্বজীবনের কথা সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। তার কলঙ্কময় জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে সংবাদ ছাপা হয়। কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে গ্রেপ্তারের জন্য বঙ্কুকে দোষারোপ করা হয় অথচ বঙ্কু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলায় রক্ত তুলে যে বক্তৃতা দেয়, তার কিছুই সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। বরং তার কলঙ্কময় জীবনের ঘটনা বৃত্তান্ত প্রথম পাতায় ছাপা হয়। ফলত তার রাগ বর্ষিত হয় সংবাদপত্রের ওপরে। এবং দোল গোবিন্দকে আদেশ দেয় সংবাদপত্র সে আগে খুঁটিয়ে দেখবে ও পড়বে তারপরে ছাপার আদেশ দেবে। ননী অধিকারীকে তার জন্য একটা কড়া আইনও লিখতে আদেশ দেয়—

> *বঙ্কু।। গায়ে তো রয়েছে একখানা উত্তরবঙ্গ পত্রিকা! দেখ না হাতে নিয়ে কথার মালশাট মেরেছে বড় বড় অক্ষরে— "বেশ্যার জন্য ত্রিদিব সিংহ গ্রেপ্তার! নূতন রাজার লাম্পট্য কাহিনী"; আরো যা যা লিখেছে পড়তে পারলে ও সালার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিতাম।*
>
> *ননী।। পড়ে শোনাব?*

বঙ্কু।। না! এই দোল গোবিন্দ মুখুয্যে পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সে এমন খলখল হেসে আর রসিয়ে যে বুঝলাম বকলমে নিজের গালগুলোই আমায় দিচ্ছে। চুপ করিয়ে দিয়েছি।

দোল।। মহারাজ ভুল করছেন, তেমন কোন অভিপ্রায়—

বঙ্কু।। আপনি তো প্রচার সচিব?

দোল।। এ্যাঁ

বঙ্কু।। তাহলে আপনি কী করছিলেন? কোন বেনাগাছে চুল জড়িয়ে পাকে পাকে বেড়াচ্ছিলেন? আমি দশ দিনে চোদ্দটা বক্তৃতা দিয়েছি।– সে সব এরা ছাপেনি কেন?

ননী।। ছেপেছে, চেপেছে বঙ্কু। পাঁচ পাতায় ছ'লাইনে সেরেছে। এর চেয়ে না ছাপলেই ভাল হত।

বঙ্কু।। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলায় রক্ত তুলে বক্তৃতা দেব আর সেটা ছ'লাইনে ফক্কা? আর মাসুল চোর জন্মদাসী প্রথম পাতা জুড়ে আমার কলঙ্ক রটনা করবে? আর আপনি রূপের নাগর তখন শহরের পথে টো টো করে মেয়েছেলে খুঁজবেন?

দোল।। না, না, শুনুন— আমি ঐ কাগজের মালিক এবং সম্পাদককে বারবার অনুরোধ করেছি—

বঙ্কু।। অনুরোধ? চার পয়সা বকেয়া আদায়ের জন্য চাষীর ঘর জ্বালাতে পার, আর কাগজের বেলায় শান্তিপুরী অনুরোধ? আমার মনে হয় আপনার মগজটা চার বছরের শিশুর, এবং সেও তাকে জো দেখে ফেলে দিয়েছিল নিশ্চয়ই নইল আপনি পেলেন কোথায়? (হঠাৎ) কাগজের মালিক কে?

দোল।। কুমার ইন্দ্রজিৎ সিংহ।

বঙ্কু।। হুঁ বুঝেছি, জমিদার নন্দনদের ষড়যন্ত্র। আজ থেকে এ রাজ্যের সব সংবাদপত্রের প্রত্যেকটা খবর আপনি আগে পড়বেন, তারপর ছাপা হবে।

ননী।। সেনসর, সেনসর, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ যা করেছিল।

বঙ্কু।। যদি দেখি সামান্যতম খবরের সামান্যতম অংশে সামান্যতম তিকড়মবাজির সামান্যতম আভাসের সামান্যতম লক্ষণ, তাহলে ঐ ইন্দ্রজিৎ সিংগি আর সম্পাদক তো বটেই, আপনাকে সুদ্ধ গ্রেপ্তার করা হবে।

দোল।। উঃ! দেখুন হুজুর এটা কি ঠিক হবে? সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এক গণতান্ত্রিক অধিকার, তাকে—

বঙ্কু।। ওঃ! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! একতাল সালা সংবাদপত্ররা স্বাধীনতা নিয়ে বানানো হয়েছে

সিদ্ধির ঝুলি, কখনো শ্যামের মুরলী!

ননী।। হ্যাঁ গঙ্গা ফেলে এদ্দিন তো পুকুরে চান করেছে।

বঙ্কু।। লিখুন ননীদা, কড়া ক'রে একটা আইন লিখুন তো। দেখাচ্ছি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। [১১২]

বঙ্কু ক্রমাগত স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে সন্দেহ আশঙ্কা তার ভিতরে দানা বাঁধতে থাকে। সে যত সন্ত্রাসের পথে এগোয় তার মনও তেমনি ক্রমশ সন্দেহ জর্জর হয়ে ওঠে। একসময় সে তার প্রিয় বিশ্বস্ত পারিষদ ঝগড়ু নাপিতকে ছাড়া অন্য কারো কাছে চুল দাড়ি কাটায় না পাছে জমিদার পক্ষের লোক নাপিত সেজে তার গলায় ক্ষুর চালিয়ে দেয় সেই আশঙ্কায় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কু উঠেপড়ে লাগে। জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শ্রমিকদের পাঁচ বছরের জন্য বোনাস বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই শ্রমিক বিরোধী প্রস্তাব প্রজা পারিষদে অনুমোদন পায় না। প্রজা পারিষদের ভোটে নাকচ হয়ে যায় সেই প্রস্তাব। বঙ্কুর পক্ষে ভোট পড়ে চল্লিশটি আর বিপক্ষে ভোট পড়ে একশো তিনটি। কিন্তু ক্রমাগত স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা বঙ্কু পেছন ফিরতে রাজি নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠতার গণতন্ত্রে সে আর বিশ্বাস করে না। ক্রুদ্ধ বঙ্কু দেওয়ান তথা মুখ্যমন্ত্রী হরকিশোরকে ডেকে পাঠায়। এবং তাকে আদেশ দেয় প্রজা পরিষদের যারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের সবাইকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় ও জেলে ভরা হয়। ফলে বাকি যে চল্লিশ জন থাকবে তারা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে এবং তাদের সামনে প্রস্তাবটা আবার পেশ করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করা হবে। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্কু এভাবে সংবিধানকে পদদলিত করতে পিছুপা হয় না—

চন্দ্র।। তোমার প্রস্তাব নাকচ ক'রে দিয়েছে প্রজা পরিষদ। পাঁচ বছরের জন্য বোনাস বন্ধ করার যে প্রস্তাব তুমি পাঠিয়েছিলে ঘণ্টা তিনেক খ্যাচোর খ্যাচোর করার পর ভোটের জোরে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে, তোমার প্রস্তাব হেরে গেছে।

বঙ্কু।। আমার পক্ষে কত ভোট?

চন্দ্র।। ৪০।

বঙ্কু।। বিপক্ষে?

চন্দ্র।। ১০৩।

বঙ্কু।। হুঁ।

ননী।। আমার মনে হয় নূতন একটা আইন পাশ করা উচিত— এরপর থেকে যে কম ভোট পাবে

সেই জিতবে।

চন্দ্র।। এই বুড়োহাবড়াই যত নষ্টের গোড়া। এই উস্কেছে ঐ অকম্মার ধাড়িগুলোকে।

হর।। বিশ্বাস করুন মহারাজ আমি এমন কিছু করতেই পারি না।

বঙ্কু।। এটা কোন দিশি গণতন্ত্র? আমি একটা কথা কইলাম, আর ভোটের জোরে সেটাকে চেপে দিল? গণতন্ত্র মানে কি এই, যে বেশি ভোট পড়লেই আমি হেরে গেলাম?

হর।। আগে তাই তো জানতাম, সংখ্যাগরিষ্ঠই তো গণতন্ত্র—

বঙ্কু।। ভুল। গণতন্ত্র মানে আমি যা বলব সবাই মিলে তাই করবে। সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। বর্মণ পুলিশ নিয়ে যাও, ইউ গোজ উইথ পুলিশ। যে ১০৩ জন বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরে দাও। বাকি থাকবে যে ৪০ জন তারা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে। তাদের সামনে প্রস্তাবটা আবার পেশ কর চন্দ্রশেখর ডোম। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হবে। এটাই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। বর্মণ! [১১৩]

গণতন্ত্র রক্ষার নামে গণতন্ত্রকে হত্যার এক নগ্ন মানসিকতা প্রকাশ পায় বঙ্কুর মধ্যে। সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অপপ্রয়োগ করে বঙ্কু। নানারকম অত্যাচার-অন্যায় নিপীড়ন করে নিজের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা বজায় রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য। আইন-সংবিধান সবই সরকারের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সেটাও অপশাসন প্রয়োগের জন্য। রাজা বঙ্কু তার মন্ত্রীকে সংবিধান কেটেকুটে সংশোধন করতে আদেশ দেন নিজের ইচ্ছে মতো, নিজের প্রয়োজন মতো, নিজের সুবিধার্থে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। সংবিধানকে এই নির্লজ্জ পদলেহন ও অবমাননা দেখতে পাই বঙ্কু ও ননী অধিকারীদের উক্তির মধ্যে দিয়ে—

বঙ্কু।। ননীদা, আপনি কাল গোপন ব্যালট না কি একটা বলেছিলেন?

ননী।। হ্যাঁ। গোপন ব্যালট মানে হচ্ছে—

বঙ্কু।। (চন্দ্রকে) চল্লিশটা কাগজের টুকরোয় লেখা "হ্যাঁ"। সেগুলো খামে পুরে আঠা দিয়ে ভাল ক'রে সাঁটো, শীলমোহর কর। তারপর সেগুলো দাও ঐ চল্লিশটি সদস্যের হাতে। বল, এবার সংবিধান সংশোধনের ওপর ভোট দাও।

হর।। এ কি? এ আবার কি? ঐ বন্ধ খামগুলো ওঁদের ভোটপত্র?

বঙ্কু।। হ্যাঁ।

হর।। খুলে দেখতেও পাবে না কি ভোট দিচ্ছে?

বঙ্কু।। নিশ্চয়ই না। এটা গোপন ব্যালট, আপনি জানেন কি গোপন ব্যালট হল গণতন্ত্রের এক প্রধান স্তম্ভ? এতদিন আপনারা এসব করতে দেননি, আমি এসে চালু করলাম।

ননী।। সিক্রেট ব্যালট হল গে তোমার গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। [১১৪]

১৯৭৭ সালের এমারজেন্সি সময়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয় সংবাদপত্রের ওপরে সেন্সরশিপ। কোনো সংবাদ ছাপতে গেলে সেটি আগে শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হত, শাসকের বিপক্ষে গিয়ে অথবা শাসকের মনোগত না হলে কোনো সংবাদ প্রায় ছাপাই হত না। শাসকের কুকাণ্ডের কথা তো দূরস্ত বরং শাসকের অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতাগুলোকে প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে ছাপতে বাধ্য করা হত। এমারজেন্সির পটভূমিকায় সারা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণি নিজের মতো করে আইন রূপায়ণ ও বলবৎ করতে থাকে। যার এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী পক্ষের কণ্ঠরোধ ও বিরোধী পক্ষকে যেন তেন প্রকারে অবদমিত করা। আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যখন তখন সংবিধান পরিবর্তন ও আইন বলবৎ করা যার জোরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসন মিলিটারি দিয়ে বিরোধী জোটকে দুর্বল করা ও সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপল দত্ত পরাধীন মেচগীর রাজ্যের রাজা স্বৈরাচারী বঙ্গেশ্বর সিংহের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন শাসক শ্রেণির মানসিকতা ও চরিত্রকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বঙ্গেশ্বর সিংহের স্বৈরাচারী মানসিকতা ও অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা, শাসন-শোষণের স্বৈরাচারী পদ্ধতি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরে উৎপল দত্ত সমকালীন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

রাজা বঙ্কু নিজের ইচ্ছে মতো রাজ্য শাসন করার উদ্দেশ্যে সংবিধানকে ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে নিজের সুবিধা মতো। এমতাবস্থায় দেওয়ান হরকিশোর উৎফুল্ল হয়ে মতামত প্রদান করে যে দেশে সংকট অবস্থা তৈরি না হলে দেশের সংবিধান সংশোধন করা যায় না। স্বৈরাচারী শাসক বঙ্কু সঙ্গে সঙ্গেই দেশে জরুরি অবস্থা বা সংকট অবস্থা তৈরি করতে উদ্যত হয়। সে তার দেওয়ান হরকিশোরকে আহত করার চেষ্টা করে। এবং তার দেওয়ানকে আহত করার মধ্য দিয়ে দেশে সংকট অবস্থা তৈরি করতে চায় যার বলে সংবিধানটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। যাতে কেউ সংবিধান পরিবর্তন নিয়ে যেন কোনো রকম প্রশ্ন করতে না পারে—

বঙ্কু।। তা সংকট-অবস্থা একটা সৃষ্টি ক'রে নিলেই তো হয়।

হর।। কি?...

বঙ্কু।। আমি বলি এই দেওয়ানের প্রাণনাশের লোমহর্ষক চেষ্টা হোক।

চন্দ্র।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উত্তম প্রস্তাব। একটা বল্লম দিয়ে এর ডান উরুটা এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দিলেই—।[১১৫]

শ্রমিকদের বোনাস বন্ধ করে দেওয়ায় ভীষ্মলোচন দাস ও ওসমান শেখের নেতৃত্বে শ্রমিকরা অরণ্য শ্রমিক ইউনিয়ন একত্রিত হয়েছে ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বঙ্কু বোনাসের দাবির মতো ধর্মঘটকেও বে-আইনি ঘোষণা করেছে। সে কঠোরতম উপায়ে সমস্তরকম প্রতিকূলতাকে স্তব্ধ করে দিতে চায় প্রথমেই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। ব্রিগ্রেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈনদল পাঠানো হয় বামপন্থী নেতা ভীষ্মলোচন দাস ও ওসমান শেখের নেতৃত্বে ধর্মঘট ডাকা শ্রমিকদের নিঃশেষ করতে। সমস্ত মিটিং মিছিল, ধর্মঘট, বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কাজকর্ম বে-আইনি ঘোষিত হয়। স্বৈরাচারী শাসক বঙ্কুর মধ্যে এক ভণ্ডামির মুখোশ পরিলক্ষিত হয়। তার ফাঁকা বুলির মধ্যে উঁকি মারে এক কুচক্রী মানসিকতা ও ক্ষমতা লোভের নির্মম প্রচেষ্টা। যখন ব্রিগেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব হয় তখন চন্দ্রশেখর ডোম তার প্রতিবাদ করে। তখন বঙ্কু সুকৌশলে শ্রমিক নেতা ভীষ্মলোচন দাস ও শেখ ওসমানকে আলোচনার জন্য প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়, অপরদিকে ব্রিগেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈন্য সমাবেশও করা হয়। আলোচনা করতে এলে তারা যখনই প্রাসাদে পা দেবে তখনই তাদের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা বঙ্কু করে—

ট্যাংরা।। মহারাজ! অরণ্য শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে!

ঝগড়ু।। ধর্মঘট তো বেআইনি।

ট্যাংরা।। তবু ডেকেছে। বলে বোনাস দিতে হবে।

ঝগড়ু।। বোনাস তো বেআইনি।

ট্যাংরা।। তবু চাইছে। ওদের নেতা হচ্ছে ভীষ্মলোচন দাস এবং শেখ ওসমান।.....

ঝগড়ু।। বর্মণকে পাঠাও সৈন্য দিয়ে।

চন্দ্র।। না, না, আমরা সব চাষীর ছেলে। চাষীদের নয়নের মণি ভীষ্ম আর ওসমানকে ধরতে সৈন্য পাঠাব?

বঙ্কু।। কখনো না, এ রাজদেহে প্রাণ থাকতে নয়।

ননীদা।। যান ওদের কাছে, বোঝান ওদের— মেচগীর রাজ্যের অভ্যুদয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না, নেহহরুদের হাত জোরদার কোরো না, মোটে পাঁচটা বছর বোনাসের আশা ছেড়ে দিয়ে কাজ

কর দশের স্বার্থে। ওদের মিটিঙে ডাকুন। বলুন, মেচগীরের অধীশ্বর ওদের সঙ্গে কথা কইবে।... ঐ ভীষ্ম আর ওসমান আমার ভাই। কিন্তু রক্তের টানের চেয়ে আমার কাছে দেশের স্বার্থ বড়। যাও! ঠিক তিনটের সময়ে দেওয়ানের পশ্চাদ্দেশে গুলি করবে। তারপর এখানে ফিলে উদ্যানে সৈন্য-সমাবেশ কর। আমার অগ্রজপ্রতিম ভীষ্ম দাস ও অনুজপ্রতিম শেখ ওসমান সন্ধ্যাকালে এ প্রাসাদে পা দেয়ামাত্র তাদের গ্রেপ্তার করবে। উঃ, রাজকার্য কি নির্মম! বুক ভেঙে যায় তবু কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতেই হয়। [১১৬]

স্বৈরাচারী শাসক তার স্বৈরাচারের সমস্ত মুখোশ উন্মোচন করে। নিজেকে হিটলারের মতো করে ভাবতে থাকে ও হিটলারের আদলে চুল ও গোঁফ রেখেছে বঙ্কু। বঙ্কু ক্ষমতাবলে আদালতের সমস্ত ক্ষমতা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ প্রজা পরিষদে বঙ্কুর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল যে একশো তিন জন তাদের মধ্যে আঠাশ জনকে আদালত ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। তাই বঙ্কু আদালতের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে ননী অধিকারীকে দিয়ে একটা আইন লিখিয়ে নেয়—

ননীদা লেখো তো একটা আইন— আজ থেকে আদালত থাকবে, কিন্তু তার কোন মান্যতা থাকবে না।... আমরা যা করব তার বিরুদ্ধে কড়ে আঙুলটি তুললে জজের জেল হবে। [১১৭]

ভীষ্ম ও ওসমান বঙ্কুর আহ্বানে মিটিং-এ আসার কারণও জানতে চায়, তার উত্তরে ট্যাংরা এসে জানায় যে তারা মিটিং-এ তো আসবেই না উপরন্তু দুশো লোক নিয়ে ওরা পুলিশের অস্ত্রাগার লুঠ কর প্রচুর বন্দুক আর গুলি হাতিয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেছে। একথা শুনে বঙ্কু আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মণকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয় প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে যেন দেখা মাত্রই গুলি করা হয়, তাদের গ্রেপ্তার করার আর প্রয়োজন নেই এবং ননী অধিকারীকে অরণ্যযুদ্ধের আর একটা খসড়া তৈরি করতে নির্দেশ দেয়—

বর্মণ, আপনার হাতে যত সৈন্য আছে সবাইকে নিয়ে চক্রধামপুর চলে যান। জঙ্গল ঘিরে ভীষ্মের দলকে নিশ্চিহ্ন করে আসুন। না। বন্দী করারও আর প্রয়োজন নেই, ধরামাত্র গুলি ক'রে মারবেন— প্রত্যেককে। ননীদা আর বর্মণ বসে অরণ্যযুদ্ধের একটা খসড়া তৈরী করুন। আমাকে কপি দেবেন একটা, দেখব, কী করছেন। [১১৮]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর শাসক দল ক্ষমতা কায়েম রাখতে সবরকমের দমন পীড়ন সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল। এই সন্ত্রাস দমনপীড়নে সাহায্য করল তাদের স্নেহ ও মদতপুষ্ট গুণ্ডার দল। রাজনৈতিক নেতা থেকে পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতির এক নির্লজ্জ অভিসন্ধি পরিলক্ষিত হতে থাকল সর্বত্র। বিরোধী জোট বিশেষত কমিউনিস্ট

পার্টি ও জনতার ওপরে শাসক শ্রেণির দুর্বিষহ অত্যাচার চলতে থাকল অনবরত। একের পর এক আইন প্রণয়ন করে বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করাই ছিল শাসকের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাতে তারা শাসকের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে না পারে। আলোচ্য নাটকে স্বৈরাচারী রাজা বঙ্কু যেন এমারজেন্সির সময়ের সেই শাসকের প্রতিরূপ। বিরোধী অর্থাৎ কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ভীষ্ম ও তার সহযোগী ওসমানকে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ দেন। শ্রমিক আন্দোলন ও সমস্ত ধর্মঘটকে তিনি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু গোপনে গোপনে কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলতে থাকে। তাদের একত্রে জোটবদ্ধভাবে সংগঠন বাড়িয়ে তোলা ও দলীয় কর্মীদের সংঘবদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা দেখা গিয়েছিল এমারজেন্সির সময়ে শাসক শ্রেণির সমস্ত অত্যাচার-অন্যায় ও বীভৎসতাকে সহ্য করার পরেও তারা গোপনে গোপনে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে। খোদ ননী অধিকারী এই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতমা সদস্যা হলেন বঙ্কুর মহারানী যমুনা। ননী অধিকারী গোপনে যমুনা মারফত অরণ্য যুদ্ধের প্ল্যানের যে কপি তৈরি করা হয়েছিল সেই কপি একখানি শ্রীনিবাস ময়রা মারফত ভীষ্মের কাছে পাঠানো হয়। ফলে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভীষ্মদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার বর্মণের বাহিনী পরাজিত হয় ও আহত হয়ে ফিরে আসে। এতে বঙ্কু আরও অপমানিত হয়, সে সান্ধ্যআইন জারি করে। টাউন হলের মাঠে কমিউনিস্ট পার্টির যে মিটিং সেই মিটিংকে তিনি গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করতে নির্দেশ দেন—

> *ননীবাবু, আজ থেকে কার্ফু জারি হল সারা মেচগীর রাজ্যে, বিকেলে পাঁচটা থেকে সকাল ছ'টা। লিখে আনুন। হরবাবু, আজ চারটের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি মিটিং ডেকেছে টাউনহলের মাঠে। সে মিটিং গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হবে। অন্তত দশটা মৃতদেহ যেন পড়ে থাকে মাঠে এখানে-ওখানে। তাহলে আর মিটিং ডাকবে না এ জন্মে।* [১১৯]

কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ভীষ্মলোচন ও তার দলবল গোপনে যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম সহ্য করে তাদের আন্দোলনকে সঠিক পথে নিয়ে গেছে, শতরকম অত্যাচার জুলুমবাজি সহ্য করেও আন্দোলনের জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তা এমারজেন্সির সময়কার কমিউনিস্ট নেতাদের আত্মত্যাগ আন্দোলন-মিটিং মিছিল ও গোপনে সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার নিপীড়ন ক্রমাগত বাড়তে থাকল। বঙ্কুর স্বৈরাচারী শাসন ক্রমবর্ধিত হতে থাকল। সেই শাসন থেকে মুক্তির লড়াই শুরু হয় সমস্ত রাজ্যব্যাপী। শ্রমিক-কৃষক সম্মিলিতভাবে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। মিটিং-মিছিল অবরোধ

ও ধর্মঘটে রাজ্যকে অচল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে। কোণঠাসা বঙ্কু একা হয়ে পড়ে, তার পাশের বিশ্বস্ত পারিষদবর্গ ও মানুষজনেরা ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় ক্ষিপ্ত উন্মত্ত বঙ্কু নির্ভর করে দেশের গুণ্ডা ও মস্তানদের ওপর। দেশের পুলিশ-মিলেটারি প্রশাসনের ওপরে। বঙ্কু তবুও বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। তার প্রিয় ননী অধিকারীও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সব বিশ্বাস হারিয়ে শেষপর্যন্ত বঙ্কু ব্রিটিশ রাজশক্তির দ্বারস্থ হয়। মেচগীর রাজ্যকে রক্ষার জন্য এবং তার সিংহাসন রক্ষার জন্য বঙ্কু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু ননী অধিকারী একজন কমিউনিস্ট গুপ্তচর হিসেবে আবার চক্রান্ত করে, সে কৌশলে রাজার সাজ পরে বঙ্কুর ভূমিকায় নেমে রাজার যে আদেশ ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি, সেই আদেশকে পালটে দেয়। ব্রিটিশ শক্তি পড়ে চরম অস্বস্তির মুখে। এরাজ্যে তাদের পদার্পণ পিছিয়ে যায়। সেই সুযোগে ননী অধিকারী সারাদেশে কর্মচারীদের ছুটি ঘোষণা করে দিয়ে রাজ্যের প্রশাসনকে একপ্রকার স্তব্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় বঙ্কু পড়ে যায় চরম অসহায়তার মধ্যে। বঙ্কুকে দিয়ে আর রাজার পালা করানো যাবে না এটা বুঝতে পেরে চামারিয়া, হরকিশোর, দোল গোবিন্দ এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মণ বঙ্কুকে হত্যা করে। নতুন রাজা হিসেবে তারা রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের নাম ঘোষণা করে।

এমারজেন্সির ভয়াবহতা এই নাটকের মূল এবং অন্যতম দিক, সেই সঙ্গে এই নাটকের আরেকটি দিক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, রাজার পালায় যারা রাজা সাজে তারা পালাতেও যেমন কুশীলব, রাজ্য শাসনেও তেমনি। পিছন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে চামারিয়া, দোল গোবিন্দ ও হরকিশোরের মতো বেনিয়ারা। তাদের ইচ্ছা মতো তারা রাজা নির্বাচন করে। আবার তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে তারা প্রয়োজন মতো রাজা পরিবর্তন করতেও পারে। রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অদৃশ্য সুতো তাদের হাতেই থাকে। তারা ইচ্ছা মতো রাজাকে পুতুলের মতো নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে আবার হাসাতেও পারে। নাটকের শেষভাগে ননী অধিকারীর বক্তব্যটি তাই স্মরণযোগ্য—

> *আমরা ভাবি আমরাই বুঝি আসল ভাগ্যবিধাতা। আসলে আমরাও পুতুল।... তোমার সুতোও বাঁধা রয়েছে বানিয়া জমিদারদের হাতে।* [১২০]

ভারতবর্ষেও সেই সময় দেখা যায় এমারজেন্সির বাধ্যতামূলক অবসানে নির্বাচন সংগঠিত হল তাতে ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় ঘটে। সিংহাসনে যারা আরোহণ করলেন, জোটধারী জনতা দল তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা গেল না। আবার পুনরায় নির্বাচন সংগঠিত হল। সেই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি ফিরে এলেন। তিনি এবার অনেক সংযত ও পূর্বের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। পশ্চাতের অঙ্গুলি হেলনে অর্থাৎ বেনিয়াদের অঙ্গুলি হেলনে তিনি আর ততটা দুলছেন না। ফলে তার পরিণতি হল

চরম— মৃত্যু। ব্রিটিশরা এই দেশ থেকে চলে গেলেও অর্থনৈতিক পরাধীনতা, বেনিয়া শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে এদেশের তখনও মুক্তি ঘটেনি। এই পুঁজিপতি বা শিল্পপতিরা সদা সর্বদাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। শাসন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষকে ক্রমাগত শোষণ করে চলে। অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজে পুঁজিবাদ তার ইচ্ছা মতো রাজা বদল করে, পুতুল রাজাদের সামনে রেখে রাজ্য চালায় এই পুঁজিবাদ শ্রেণি। তাই আসল শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। মুক্তিকামী মানুষজনের এই পুঁজিবাদকেই উৎপাটন করতে হবে, তার জন্যই প্রয়োজন সংগ্রাম। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নির্মূল করা যেতে পারে, উৎপল দত্ত সেই বার্তাই দিয়েছেন।

'এবার রাজার পালা' নাটকটি রচিত ও প্রযোজিত হয়েছিল সত্তর দশকের মধ্যভাগের ভারতের জরুরি অবস্থার সময়ে। আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত এক কাল্পনিক রাজ্যে কাল্পনিক রাজার স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ-এর বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কুর এই স্বৈরাচারী কার্যকলাপ যেন প্রকারান্তরে ঘটে চলেছিল ১৯৭০ দশকের এমারজেন্সির সময়কার ভারতবর্ষে। ১৯৭৫ খ্রি. ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে যেভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্র শাসনের যে রূপ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল, মেগচীর কাল্পনিক রাজ্য যেন তারই দর্পণ। ক্ষমতালোভীর নির্লজ্জ প্রচেষ্টার জন্য দেশের সংবিধানকে পদদলিত করে তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিজ সুবিধামতো গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির পুত্র সঞ্জয় গান্ধি সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এমারজেন্সির সময়ে যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অপপ্রয়োগ করেছিল তা যেন বঙ্কুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'এবার রাজার পালা' নাটকটি সমকালীন রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মানদণ্ডে নাটকের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ও রাজনৈতিক নাট্যশালার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন হয়ে উঠেছে।

লেনিন কোথায়

প্রথম অভিনয় : ১৯৭৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, মিনার্ভা

প্রথম প্রকাশ : এপিক থিয়েটার, মে-জুন ১৯৭৯

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ঘোষিত হল এমারজেন্সি। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন এলাহাবাদ

হাইকোর্ট তদানীন্তন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেন। নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগে বিচারপতি জগমোহন লাল সিনহা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে রায় দেন, যে তিনি পরবর্তী ছয় বছর ভোট প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায় হেরে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধি ক্ষমতা দখল রাখার জন্য সারা দেশব্যাপী এমারজেন্সি বা জরুরি ব্যবস্থা জারি করলেন। হঠাৎ ভারতবর্ষের বুকে এক অন্ধকার রাত্রি নেমে এল। সমস্ত বিরোধী পার্টির কর্মীরা হতচকিত, ভীত সন্ত্রস্ত। তারা আত্মগোপন করলেন, কেউবা দেশান্তরী হলেন। বিরোধী নেতাকর্মীদের অবাঞ্ছিত ধরপাকড়, পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রকাশ্যে খুন, ধর্ষণ, হত্যা কোনো কিছুই বাদ ছিল না। বাইরে তখন আর কোনো কাজ করার পরিস্থিতি ছিল না। মিটিং-মিছিল বন্ধ, প্রকাশ্যে পার্টির সব কাজ করা বন্ধ। সংবাদপত্রে চালু হল সেন্সরশিপ। বামপন্থী থেকে শুরু করে সব ধরনের সংবাদপত্রেই সেন্সরশিপ চালু করা হল। খবরের বেশিরভাগ অংশই সাদা। সম্পাদকীয় কলম সেটিও সাদা, এমনকি গোটা পত্রিকাটি সাদা। এভাবে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকল সেন্সরশিপ-এর জেরে। শাসকের বিরুদ্ধে, অন্যায়-এর বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ ছাপা হল না। যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন, পার্টিকর্মীদের ওপর চলতে থাকল সন্ত্রাসের দমন-পীড়ন। এই রকম এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক হানাহানি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন 'লেনিন কোথায়'।

'লেনিন কোথায়' নাটকে উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন ১৯১৭ সালে জুলাই থেকে অক্টোবর অর্থাৎ রুশ বিপ্লবের প্রাক্‌কালে লেনিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা কীভাবে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের মোকাবিলা করেছিল এবং বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন ও সফল হয়েছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের এই সময়ে রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনে সে দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবই ভেঙে পড়েছিল। দেশের বৃহৎ অংশে দুর্ভিক্ষ ও প্রবল খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হয়, অথচ মজুতদাররা গুদামে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত করতে থাকে। ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি হয় একের পর এক কারখানার মালিকদের লকাউট ঘোষণা ও হাজার হাজার শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে। শ্রমিকদের বৃহৎ একটি অংশ কর্মচ্যুত হওয়ার ফলে অনাহারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ জনতার মধ্যে তীব্র হতাশার জন্ম নেয়। সেই হতাশা থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভে জনতা ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে দেখা যায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, দুর্বিষহ রাজনৈতিক পীড়ন ও শোষণের ফলে বিরোধী পক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিরোধী নেতা ও কর্মীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, নইলে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি হয়ে উঠেছিল নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। বিপ্লবের প্রাক্‌কালে

লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য আত্মগোপন করে থাকতেন। সেইসময় তাঁকে ধরার জন্য শাসক গোষ্ঠীর মরিয়া চেষ্টা, তাঁকে হত্যা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকে শাসকগোষ্ঠী। এইরকম দুর্বিষহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস শোষণ ও শাসনের সামনে দাঁড়িয়ে পার্টিকর্মীদের কর্তব্য কী? শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে লেনিন কীভাবে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা দেখানো হয়েছে এই নাটকে। রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে লেনিনের নেতৃত্ব এবং প্রাক্‌বিপ্লব কালে পার্টিকর্মীদের ও সাধারণ মানুষের কর্তব্যসমূহ সুন্দরভাবে নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ও জনগণকে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর ও মোকাবিলা করার রাস্তা দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেশে এমারজেন্সির পটভূমিকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে যখন মানুষের জীবন বিপন্ন, পার্টিকর্মীরা বিশেষত বিরোধীরা যখন দিশেহারা, স্বচকিত-স্তম্ভিত। রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বিরোধী দলকে অবদমিত করা, প্রকাশ্যে খুন, পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি চলতে থাকল নির্বিচারে। বিরোধী রাজনৈতিক দল একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের মনোবল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। দেশের এমতপরিস্থিতিতে নাট্যকার লেনিনের মতো একজনকে সন্ধান করেছেন। যে এই পার্টিকর্মীদের হৃত মনোবল ফিরিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করতে পারে, নতুনভাবে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যেমনটা রাশিয়ায় লেনিন করেছিল। লেনিন-এর জীবন কথা ও তাঁর কার্যকলাপ, বিপ্লবের পন্থা উৎপল দত্তকে বারে বারে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই নিজের দেশের এই দুর্দিনে, এইরকম রাজনৈতিক ভীতির মধ্য দিয়ে তিনি বারবার লেনিন ও তাঁর জীবন কথা এবং আদর্শকে স্মরণ করেছেন। এদেশের ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক কালসীমায় উৎপল দত্ত সন্ধান করেছেন বিপ্লবী বীরকে, যে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে।

আমরা ‘লেনিন কোথায়’ নাটকটির বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব, ১৯১৭-এর প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা। এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে লেনিন কীভাবে পার্টি কর্মীদের সংগঠিত করেছেন, প্রবল খাদ্যাভাবের মধ্য দিয়ে নুইয়ে পড়া শ্রমিকদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পরিকল্পনা মাফিক একের পর এক শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে তিনি বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। জোরদার, মুনাফাবাজ, কালোবাজারির পতন ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন। সেই সঙ্গে আমরা এটাও দেখার চেষ্টা করব এমারজেন্সির সময়ে ভারতের প্রেক্ষাপটে, কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধারে, তাদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হতে এই নাটকটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এদেশের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কালে লেনিন-এর আদর্শ, কর্মপন্থা কতটা এদেশের পার্টিকর্মীদের সংগঠিত করেছিল ও বিপ্লবের হদিস দিয়েছিল তা দেখার চেষ্টা করব।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সমসময়কালে রাশিয়ার বৃহৎ অংশে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা যায়। ব্যাপকহারে দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ করা যায় কিন্তু মজুতদারদের গুদামে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। দিকে দিকে শ্রমিকদের কর্মহারা হয়ে পড়া, অনাহারগ্রস্ত হয়ে জনজীবনে তীব্র হতাশা নেমে আসে। এইসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন কোরেন্স্কি। তিনি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং একাধিক পার্টির সমন্বয়ে সরকার গঠন করেছেন। সরকারের সর্বস্তরে চলছে ঘুষের রাজত্ব, সমাজবিরোধীদের প্রশয় দেওয়া একপ্রকার চূড়ান্ত দুর্নীতি। সুশাসনের পরিবর্তে গুণ্ডা-খুনি-তোলাবাজরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত দেশব্যাপী। প্রধানমন্ত্রী কোরেন্স্কির নেতৃত্বে সরকার জমি নীতি এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে কৃষকদের হাতে কোনো প্রকার জমি না থাকে, সব জমির অধিকার যেন জমিদারদের দখলে থাকে। মজুতদাররা এই দুর্ভিক্ষের সময়ে গুদামে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত করে রাখতে শুরু করে, কিন্তু এই সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার যাতে না করা যায় তার জন্যও আইন প্রণয়ন করে। সরকারের সর্বত্রব্যাপী চলছে চরম নৈরাজ্য। এক শরিকের সঙ্গে অন্য শরিকের দ্বন্দ্ব চলছে, বিরোধ চলছে, একে অপরকে খুন করার জন্য গুণ্ডা পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছে। গুণ্ডা-খুনি-বদমায়েশদের দিয়ে দেশ চালানোর একটা প্রচ্ছন্ন মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। গুণ্ডা-খুনি-বদমায়েশরা সারা দেশব্যাপী শুধু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাই নয়, পুলিশ যদি তাদের গ্রেফতার করে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের নির্দেশে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এইসব খুনি বদমায়েশরা সবাই মন্ত্রীদের পোষ্য। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিকোলাই স্কোবেলেভ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী জেনারেল নিকোলাই আলেকসেইচ আলেকসেইয়েভ-এর কথোপকথনে নাটকের প্রথম দৃশ্যে সেই চিত্র ফুটে ওঠে—

স্কোবেলেভ।। ... কাল পুলিশ আমার দলের তিনজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের ছেড়ে দেয়া হোক।

কেরে।। কেন ধরেছে?

আলেকসেইয়েভ।। গুণ্ডামি করেছিল, ধরা হয়েছে। মদ খেয়ে রাস্তার ওপর ছেনতাই করছিল।

স্কোবে।। মিথ্যা কথা। ওরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। উপদলীয় চক্রান্ত করে ওদের ধরা হয়েছে।

আলোক।। তিনটেই দাগী বদমায়েশ। ডাকাতি করে জেল খেটেছে—। এই মন্ত্রী স্কোবেলেভ ঐসব ঘৃণ্য জীবদেহ পোষেন।

স্কোবে।। আপনারা পুলিশকে উপদলীয় কলহে ব্যবহার করছেন। কই কেরেন্স্কির গুণ্ডাদের তো ধরা হয় না! ওঁর ক্রুদোভিক পার্টি শত শত মাস্তান পোষে।

কোবে।। আর একটা কথা কইলে আমি পদত্যাগ করব। তখন দেখি অপোগুণ্ডরা কি করে রাজত্ব চালান।

আউয়ের।। আস্তে। কোনো গুণ্ডাকেই এখন ধরা হবে না, সব ছাড়া হবে। বলশেভিকদের শেষ করে দেবেন বলছেন। গুণ্ডা ছাড়া কি করে করবেন? [১২১]

দেশের সর্বত্র শুধুই দুর্নীতি, খাদ্যমন্ত্রী পিয়েতর পেশেথনোভ-এর কেলেঙ্কারির জন্য দেশে খাদ্যের এই দুরবস্থা তৈরি হয়। আবার ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী ভিকতর চের্ণভ আজব রকমের জমি নীতি তৈরি করেন যাতে কৃষকদের কোনোরূপ অধিকার না থাকে। কেরেন্স্কি সরকার যখন দেশব্যাপী সর্বত্র অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সেই সঙ্গে তিনি অন্য শরিক পার্টিদের অন্তঃকলহ নিয়ে জেরবার হয়ে ওঠেন। সেই সুযোগে বৃহৎ পুঁজিপতি আউয়েরবাঘ তিনিও সুযোগ বুঝে সর্বস্ব লুণ্ঠন করার প্রচেষ্টা করেন। কালোবাজারি, মজুতদারি করে সর্বস্ব লুণ্ঠন করার প্রয়াসে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। পুঁজিপতি আউয়েরবাঘ অন্যান্য মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে খোলামেলাভাবেই প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন সরকার ফেলে দেওয়ার। আর সরকার পড়ে গেলে পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় আসবে শ্রমিকরা ও তাদের নেতা লেনিন—

"আপনারা আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছেন। এই ক্যাবিনেটে আমরা অর্ধেক আর আপনারা নানা প্রগতিশীলরা অর্ধেক। আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে কিছু ধকল পোয়াতেই হয়। কালোবাজার হবে, মজুতদারি হবে, ঘুষ চলবে। এটা তো আপনারা জানতেন। তবু কেন হাত মিলিয়েছেন আমাদের সঙ্গে? কারণ অন্যথায় ক্ষমতায় আসবে শ্রমিকশ্রেণী, আসবে বলশেভিকরা, আসবে লেনিন। [১২২]

কেরেন্স্কি-র মন্ত্রীসভা আপদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মন্ত্রীসভার প্রতিটি ব্যক্তি ঘুষ ব্যতীত কোনো কাজই সম্পন্ন করেন না। কয়লা থেকে শুরু করে চিনি, চাল এমনকি প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রত্যেকটি কাজের বরাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মন্ত্রী কোনো না কোনো বিষয়ে ঘুষ খেয়ে থাকেন। কেরেন্স্কির ক্যাবিনেট সদস্যদের মিটিং-এ দেখা যায় প্রত্যেকটা মন্ত্রী ঘুষ নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে ও দেখা যায় প্রত্যেক মন্ত্রী ঘুষের বিনিময়ে একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন। ক্যাবিনেট মিটিং-এ মন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে যে ঘুষ খাওয়া নিয়ে অন্তঃকলহের বিষয়টি হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে অতীব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"স্কোবে।। চোরে চোরে এ সরকার ছেয়ে গেছে। কেউ এই আউয়েরবাখের ঘুষ খায়, কেউ বিয়াবশিন্স্কির। সব পুঁজিপতির দালাল।

কেরে।। আর বাজে কাঠ দিয়ে বন্দুকের কুঁদো তৈরি করে যুদ্ধে পাঠিয়ে রোড্জিয়াংকো সাহেব যে কোটিপতি হয়ে গেলেন, তাঁকে কে লাইসেন্স পাইয়ে দিল? আর লাইসেন্স্ কি সে বিনা পয়সায় পেয়েছে?

স্কোবে।। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগও আসলে উপদলীয় চক্রান্ত। ক্ষমতা থাকে কমিশন বসান, তদন্ত করুন।

কেরে।। প্রত্যেকটা লাইসেন্স-এর পেছনে কোনো না কোনো মন্ত্রী ঘুষ খায়— ইহা ধ্রুব সত্য।

স্কোবে।। বাইরে এসে কথাটা বলুন, আমি মামলা করব। কয়লা-কেলেঙ্কারিও ফাঁস হবে। শুধু কুঁদো কেলেঙ্কারি নয়, কয়লা কেলেঙ্কারির শেষ দেখা হোক।

সেরে।। সেই সঙ্গে চিনি কেলেঙ্কারি। চিনি কল মালিকরা কাকে ঘুষ দিয়েছে বলা হোক। [১২৩]

কেরেন্স্কি সরকারের মন্ত্রীসভা বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যেমন যুক্ত তেমনি দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার প্রচেষ্টা সকলের মধ্যে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজেদের মধ্যে যতই অন্তঃকলহে জড়িয়ে পড়ুক না কেন তাদের প্রধানতম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলশেভিকদের দমন করা, তাদের কার্যকলাপ স্তব্ধ করা। বলশেভিক পার্টিকে চূর্ণ করে তাদের সর্বোচ্চ নেতা লেনিনকে খতম করা। তার জন্য তারা বলশেভিকদের পার্টি অফিসগুলো ধীরে ধীরে দখল করতে শুরু করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। বলশেভিক পার্টিকর্মীদের গ্রেফতার ও হত্যা শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে ও তাদের সর্বময় কর্তা লেনিন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়, যাতে জনতার মনে তাদের সম্পর্কে একটা ঘৃণা জাগ্রত হয়। সেই সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ চলছিল। লেনিন তাঁর নির্বাসনকালের মেয়াদ শেষ হলে তিনি জার্মানির মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় ফিরছিলেন। সুকৌশলে সেই ঘটনাটিকে কাজে লাগায় মেনশেভিক পার্টি ও কেরেন্স্কি সরকার। রুশ শাসক গোষ্ঠী রটিয়ে দেয় লেনিন জার্মানির গুপ্তচর। তিনি জার্মান সরকারের টাকা খেয়ে রাশিয়ায় এসেছেন রাশিয়ার ভিতরে অস্থিরতা তৈরি করতে, গণ্ডগোল বাঁধাতে, রাশিয়াকে ধ্বংস করতে। যাতে রাশিয়া ও জার্মানির যুদ্ধে জার্মানি জিতে যায়। মেনশেভিকরা এই অপপ্রচার ক্রমাগত করতে থাকে যাতে জনতা এই কথাকে বিশ্বাস করে। এই অপপ্রচার করে জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এমনকি কৃষক শ্রমিকের একাংশ বিশ্বাস করতেও শুরু করে যে লেনিন ভিনদেশে টাকা খেয়ে রাশিয়ার প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে। সপ্তম দৃশ্যের শুরুতে আমরা কৃষক-শ্রমিকদের মুখে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

গ্রামে গঞ্জে শহরের বস্তিতে লোকে গান গাইছে :

"ভিনদেশে প্রভুর টাকা খেয়ে

মায়ের বুকে ছুরি মারল কে?

লেনিন, লেনিন।

দেশমাতা বেশ্যা হলেন কার ব্যভিচারে?

গরীব দুখীর অশ্রু বেচে কার টাকা বাড়ে?

লেনিন, লেনিন। [১২৪]

ভণ্ড-মেকি দেশপ্রেমের ধুলো তুলে শাসকগোষ্ঠী জনতাকে লেনিন বিরোধী করে তোলার চেষ্টা করে। বলশেভিকদের প্রতি কৃষক-শ্রমিক মনে ঘৃণা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করে। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, বেকারত্বের জ্বালায় যখন মানুষ দিশেহারা জীবনধারণ করতে এবং মানুষের যখন দিশেহারা অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তখন তাদের কাছে মিথ্যা প্রচার করে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তাদেরকে বলশেভিক বিরোধী, লেনিন বিরোধী করে তোলাই শাসকদলের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্রমিক-কৃষককে বিভ্রান্ত করার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে কেরেন্স্কি-র সরকার। তাদের অপদার্থতা, দুষ্কর্ম ও দুর্নীতি ঢাকতে ক্রমাগত জনসভায় মানুষের সামনে মিথ্যা প্রচার করে। কেরেন্স্কি-ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মিছিল ও সভা করে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে থাকেন। পুঁজিপতি আউয়েরবাখ-এর সুচতুর নির্দেশে কেরেন্স্কির মন্ত্রীরা সবাই বামপন্থী স্লোগান ব্যবহার করে জনতাকে বিভ্রান্ত করে। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতেই ভূমিসংস্কার মন্ত্রী মিখাইলোভিচ চের্ণভ-এর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করার নমুনা পাই—

> *আপনারা দেখছেন আজ মন্ত্রীরা পথে নেমে এসেছেন। কেন এসেছেন? মজুতদারদের গুদাম ভেঙে খাদ্য উদ্ধার ক'রে জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। আমাদের সরকার জনতার সরকার। জনতার স্বার্থে আমরা সংগ্রামে নেমেছি; আপনারা দলে দলে আমাদের পেছনে সমাবিষ্ট হন। চলুন যাই কালোবাজারিদের কালো হাত চেপে ধরি, গুঁড়িয়ে দিই। জনগণের সরকার জনগণের কাছে ডাক দিচ্ছে— আমাদের পাশে দাঁড়ান।* [১২৫]

দেশে প্রবল খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষের মধ্যে কেরেন্স্কি-র মন্ত্রীপরিষদ সবাই উঠে পড়ে লাগে

দেশটাকে লুণ্ঠন করার প্রচেষ্টায় সেই সঙ্গে পুঁজিপতি আউয়েরবাখও। নিরন্ন মানুষের হাহাকার, বেকার যুবকদের হাহাকার তাদের কর্ণগোচর কোনোভাবেই হয় না। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মরিয়া প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তার জন্য তারা একাধিক পার্টি মিলে সরকার গঠন করে। দেশের সর্বস্ব লুণ্ঠনের পাশাপাশি কেরেন্স্কির মন্ত্রীসভা এক এবং অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিক দল ও তাদের সর্বময় কর্তা লেনিনকে হত্যা করা। তার জন্য কেরেন্স্কির সরকার গোপনে লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। কারণ লেনিন ছিল তাদের শোষণের পথের প্রধান বাধা। লেনিনকে ধরার জন্য সশস্ত্র পুলিশ সদাসর্বদা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী স্কোবেলেভ ও নিরাপত্তা মন্ত্রী আলেকসেভ দুজনে মিলে নানা রকম পরিকল্পনা করে লেনিনকে ধরার জন্য—

> *প্রাভ্দা অফিসে আমি ঢুকব আড়াইটেয়, আপনি পুলিশ নিয়ে অতর্কিতে ঢুকবেন পঁয়তাল্লিশে। ঐ পনের মিনিট আমি কথাবার্তায় লেনিনকে আটকে রাখব। দোতলার ডানদিকে প্রথম ঘর— এক ছুটে গিয়ে জাপটে ধরবেন লেনিনকে।* [১২৬]

স্কোবেলেভ ও আলেকসেভ-এর লেনিনকে ধরার সমস্ত রকম পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় লেনিন-এর সুচারু ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার কাছে। পুলিশ যখন তাদেরকে ধরার জন্য অভিযান করে তখন লেনিন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধারা দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যান। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রতিবার লেনিনের আস্তানায় হাজির হচ্ছে এবং দেখা যায় প্রত্যেক বারেই পুলিশ আসার কিছু আগেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে আস্তানা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। কখনো শহরে শ্রমিকদের বস্তিতে আবার কখনো বা গ্রামে তার বিশ্বস্ত সহকর্মীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, কখনো এক কৃষকের ঘর থেকে অন্য শ্রমিকের বাড়িতে। এই নিরন্তর তার আস্তানা বদলানোর সময় তাঁকে বিভিন্ন রকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। কখনো ফিলল্যান্ডের দুর্ভিক্ষ পীড়িত চাষির বেশে, কখনো লেনিনের জগৎবিখ্যাত দাড়ি কামিয়ে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটিয়ে চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয়, কখনোবা পরচুল লাগিয়ে বিভিন্ন সাজসজ্জায়, বিভিন্ন কায়দায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে।

অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই লেনিন নিরলস পরিশ্রম করেই বিপ্লবী রণকৌশল সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। গোপন আস্তনা থেকে সেই রণকৌশলগুলি কমরেডদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তার পার্টির নেতৃত্বের কাছে। অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই পার্টিকর্মীদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে মনোবল বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আত্মগোপনের মধ্যেই লিখে চলেছেন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক গ্রন্থ। মেনশেভিক দল ও পুলিশের ভয়ে এক মুহূর্ত কোথাও স্থির থাকতে পারছেন না, সর্বদা একস্থান

থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছেন, এক বিশ্বস্ত কমরেডের বাড়ি থেকে অন্য বিশ্বস্ত কমরেডের বাড়িতে। কোথাও এক বিন্দু স্থির থাকতে পারছেন না, যখনই যেখানে সময় পাচ্ছেন রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়ে তার গ্রন্থ লেখা সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিটা মুহূর্তে দলীয় সংগ্রামকে পরিচালনা করছেন। কমরেডদের কাছ থেকে বলশেভিকদের আসন্ন সংগ্রামের খবরা-খবর নিচ্ছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো সময়ে লড়তে হবে, কখন লড়তে হবে, কীভাবে লড়তে হবে তার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। সুকৌশলে দেশব্যাপী আসন্ন গণঅভ্যুত্থানের ওপরে নজর রাখছেন এবং সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন যে কখন গণঅভ্যুত্থান ঘটালে সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাবের পটভূমিকায় কিছু মানুষ যখন যন্ত্রণায় ক্ষেপে উঠেছে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে, তখন বলশেভিক পার্টির বিশ্বস্ত কমরেড সের্গে আলিলুইয়েভ লেনিনকে সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু লেনিন তার কথায় বিচলিত না হয়ে তাকে সংগ্রাম শুরু করার সময়, সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে অসাধারণভাবে মতামত ব্যক্ত করেন—

সের্গে।। প্রস্তুতি শেষ হবে কবে? আর কতকাল কাপুরুষের মতন আমরা গর্তে সেঁধিয়ে থাকব? ... সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠেছে। এই তো মার শুরু করার সময়।

লেনিন।। লোক ক্ষেপে উঠলেই লড়াই জেতা যায়? কে বলেছে আপনাকে?

সের্গে।। বেশিরভাগ লোক চাইছে লড়াই।

লেনিন।। বেশিরভাগ চাইলেই লড়াই জেতা যায় না। কত লোক এল দেখতে হবে, তারপর দেখতে হবে শত্রুর চেয়ে আমাদের শক্তি বেশি কিনা। শক্তিই বড় কথা। যত বিপ্লব পৃথিবীতে হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিপুল জনতাকে পরাজিত করেছে মুষ্টিমেয় শোষক। সঠিক?

সের্গে।। হ্যাঁ।

লেনিন।। কিসের জোরে? সংগঠন, প্রচার, অস্ত্র। অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্র শিক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী গঠন সেটাই এখন কাজ। আমরা এখনো জনতাকেই পুরো পাইনি। শক্তি তো পরের কথা।

সের্গে।। জনতাকে পাইনি? খাদ্যের জন্য তারা মরীয়া হয়ে উঠেছে—

লেনিন।। খাদ্য পেলেই তারা কি মাথা নিচু করবে না? ক্ষুধার চোটে রেগে উঠেছে বলেই কি বিপ্লব সমাধা করার মতন প্রতিজ্ঞা তাদরে এসেছে? খাদ্যের নয়, বিপ্লবের ডাকে ক'জন আসবে? সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের শক্তি কী? নাকি ক'জন বলশেভিক আছেন? কৃষকদের মধ্যে কতটুকু শক্তি আমাদের? বলশেভিক শ্রমিক ফৌজের হাতে অস্ত্র কত? সোভিয়েতেই এখনো আমরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ হইনি।[১২৭]

গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি লেনিন খুবই ধীর ও সন্তর্পণে দীর্ঘ সময় ধরে নেন। তিনি মনে করেন জনতার বৃহত্তম অংশকে প্রথমে কাছে টেনে তাদেরকে বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন ও উদ্দীপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করান। শ্রমিক মজুর কৃষকের বৃহত্তম অংশ দলের অন্তর্ভুক্তি না ঘটানো পর্যন্ত সঠিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয় না বলে তিনি মনে করেন। বিপ্লবের জন্য তিনি পাঁচজন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। এঁরা হলেন স্তালিন, বুবনোভ, জেরজিনস্কি, সোয়ের্দলোভ এবং উরিতস্কি এই পাঁচজনকে অভ্যুত্থানের নেতা ঘোষণা করেন। এরাই সুকৌশলে গণঅভ্যুত্থানকে পরিচালনা করবেন এমন নির্দেশও তিনি দেন। লেনিন মনে করেন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঠিক সময় কোনটা, কীভাবে, কখন, কী উপায়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তা নিয়ে লেনিন দলের উদ্দেশ্যে আটটি শর্ত মানার নির্দেশ দেন। তিনি মনে করেন এই শর্তগুলি কমরেডরা সঠিকভাবে যদি মেনে চলেন তাহলে এই অভ্যুত্থান সঠিক পথেই এগোবে, নইলে শুধুমাত্র ব্যর্থ খুনোখুনিতে পর্যবসিত হবে। এই আটটি শর্ত হল—

> *প্রথম, অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি, বাস্তবে কথার নয়। অর্থাৎ পার্টি হবে সম্পূর্ণত শ্রমিকের পার্টি। দ্বিতীয়, অভ্যুত্থান ঘটবে এমন সময়ে যখন জনতার আন্দোলনে একটা জোয়ার ডেকেছে। তৃতীয়, যখন জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আমরা পেয়ে গেছি। চতুর্থ, সর্বপ্রকার আপসপন্থী পার্টির যখন নৈতিক পরাজয় ঘটে গেছে। পঞ্চম, শত্রুর সেনা ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যখন আমাদের প্রভাব ছড়িয়েছে। ষষ্ঠ, আমাদের স্লোগানগুলি যখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সপ্তম, কৃষকদের একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন যখন আমরা পেয়ে গেছি। অষ্টম, যখন অর্থনৈতিক অবস্থা এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, জনতার মধ্যে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের মোহটা আর নেই।*[১২৮]

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করার আটটি শর্ত, যা লেনিন নির্ধারিত, সেই আটটি শর্ত যথাযথভাবে পালিত হলে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করা যেতে পারে। তার মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পৌঁছানো সম্ভবপর হয়ে উঠবে। শর্তগুলি মেনে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হলে আর থামা নেই, বিরতি নেই। লেনিনের মতে আত্মরক্ষা হচ্ছে অভ্যুত্থানের মৃত্যু। অভ্যুত্থান মানে ক্রমাগত আক্রমণ, আবার আক্রমণ, পরপর আক্রমণ। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর আন্দোলন কোন পথে যাবে, কীভাবে এগোবে, কার নেতৃত্বে কীভাবে, কখন, কোন সময়ে কী কৌশলে আক্রমণ এগোবে তার একটা নকশা লেনিন অঙ্কন করেন দলীয় কর্মী ও বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে—

> *শত্রুকে দাঁড়াতে দেয়া চলবে না। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় ছোট ছোট সাফল্য অর্জন করতে হবে।*

বিপ্লবী বাহিনীর সদর দপ্তর গড়তে হবে, সঠিক জায়গাগুলিতে বাহিনীকে মোতায়েন করতে হবে, প্রথমেই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলি যুগপৎ আক্রমণে দখল করতে হবে, প্রত্যেকটি রেলস্টেশন দখল করতে হবে, পুলিশের সদর দপ্তর, থানা, সরকারি ভবন সব আক্রমণ ও দখল করতে হবে। সর্বোপরি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে হবে, যাতে আমাদের আক্রমণ হয় অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত। [১২৯]

রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক মজদুর শ্রেণি একত্রে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে অত্যাচারী কেরেন্স্কি সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শামিল হল। বলশেভিকরা জনতার বৃহৎ অংশকে নিজেদের দিকে নিয়ে এল, অত্যাচারী জনবিরোধী কেরেন্স্কি সরকারকে পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। লেনিনের সুতীক্ষ্ণ ধারালো বুদ্ধির দ্বারা সেনা পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করে তাদের বেশিরভাগ অংশকে নিজেদের দলে টানতে সক্ষম হল। খাদ্যাভাব অত্যাচার থেকে জনতার রোষ, সেই রোষ ধীরে ধীরে আন্দোলনে পরিণত হল এবং গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকত ধীরে ধীরে। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অত্যাচারিত-শোষিত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। পুঁজিপতিদের নিঃশেষ করে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হল।–

কমরেড্স, যে শ্রমিক কৃষক বিপ্লবের কথা আমরা বলছিলাম তা সম্পন্ন হয়েছে, এই বিপ্লবের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই— আজ থেকে সোভিয়েতেই হল সরকার যে সরকারে পুঁজিপতিদের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। নিযার্তিত জনতা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলবে। পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভিৎশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হবে এবং সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলা হবে। এবার আমরা... রাশিয়ায় সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কাজ আরম্ভ করব। বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! [১৩০]

উৎপল দত্ত এদেশের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কালে লেনিন কোথায় নাটকটি প্রযোজনা করেন। নাটকটি রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সময়কালে জনগণের বিপ্লবের সঠিক দিশা দেখিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকালে মানুষের ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মধ্যবিত্তের দোলাচল মানসিকতার গণ্ডি অতিক্রম করার পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত বিপ্লবী কর্মে যে বিপদ আসতে পারে এবং তা থেকে উত্তরণের পথও নির্দেশ তিনি করেছেন। বিপ্লবের হুজুক নয় সঠিক পথে সঠিক সময়ে বিপ্লবের অভ্রান্ত পথ নির্দেশ রচিত হয় নাটকটিতে। বিপ্লবীদের গণঅভ্যুত্থানের যে আটটি কার্যক্রম উপস্থিত করেন, তা নাটক ছাড়িয়ে সব দেশের সব বিপ্লবী কর্মীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে।

একলা চলো রে

প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

প্রথম প্রকাশ : আজকাল পত্রিকা [শারদীয়], ১৩৯৭

মহাত্মা গান্ধির জীবনের শেষ আট মাস সময়কালকে অবলম্বন করে আলোচ্য নাটকটি রচিত। গান্ধি ও গান্ধিবাদের দ্বন্দ্ব, দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, গান্ধিহত্যা প্রভৃতি ঘটনা বৃত্তান্ত ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব রাজনৈতিক ঘটনা বৃত্তান্তকে নিয়ে উৎপল দত্ত লিখলেন 'একলা চলো রে' নাটকটি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এই স্বাধীনতা এলো বাংলা এবং পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে। দেশ বিভাগের মূল কারণ হিসেবে যে সিদ্ধান্তগুলি ছিল, সেই সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি অসাধারণ কৌশলের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন নাটকের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি সেগুলোর অন্তর্তদন্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন উৎপল দত্ত। দেশ বিভাগ কেন হয়েছিল, কারা কীভাবে চক্রান্ত করে দেশটাকে ভাগ করেছিল, এতে কাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছিল বা কাদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছিল, কারা বা দেশভাগের বিরোধিতা করেছিল এইসব রাজনৈতিক প্রশ্নের সন্ধানে উৎপল দত্ত ব্রতী হলেন। বাংলা তথা দেশভাগের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক কারণগুলি নিহিত ছিল সেগুলিকে উৎপল দত্ত থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জনগণকে জানানো ও প্রকাশ্যে আনা কর্তব্য বলে মনে করলেন। অর্থাৎ দেশ বিভাগের রাজনৈতিক সত্য উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস করলেন উৎপল দত্ত। এই প্রক্রিয়ারই ফসল তাঁর 'একলা চলো রে' নাটকটি।

'একলা চলো রে' নাটকে একের পর এক দৃশ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের এক একটি খণ্ড হাজির হয়েছে এবং সেগুলি বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিপলস লিটল থিয়েটার 'একলা চলো রে' নাটকটি প্রযোজনার সময় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল তাতে উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন—

> *নাটকটি দেশ বিভাগ ও গান্ধি হত্যার অনুদ্‌ঘাটিত ইতিহাস এবং এই নাটকে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা ও সংলাপ ঐতিহাসিক।* [১৩১]

নাটকটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালের সময়কে তুলে ধরা হয়েছে, সেই ক্রান্তিকাল স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ গান্ধিজিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধিজির জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। গান্ধিজির জীবনের শেষ লগ্নে এসে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক ইতিহাসে

তার গুরুত্ব প্রভৃতি 'একলা চলো রে' নাটকে উৎপল দত্ত ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে উন্মোচিত করেছেন। এখানে গান্ধিজির সমগ্র জীবন ও কর্মের বিস্তৃত পরিচয় বর্ণিত হয়নি, শুধুমাত্র দেশভাগ ও ক্ষমতা লাভের জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্র, তৎকালীন কংগ্রেসি নেতাদের ভূমিকা এবং গান্ধি হত্যার নেপথ্যে প্রকৃত কাহিনিটি উৎপল দত্ত এই নাটকে প্রকাশ করেছেন।

নাটকের ঘটনা ঘটেছে তিনটি জায়গায়— বাংলার নন্দীগ্রাম, দিল্লি এবং মুম্বাই-এ। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী বাংলার নন্দীগ্রাম। প্রবীণ গান্ধিবাদী কংগ্রেসি নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তী ও তার দুই ছেলে সন্তোষ ও প্রিয়তোষ। সন্তোষ ও প্রিয়তোষ ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই-এ শামিল হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ডানকান সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেছিল নন্দীগ্রাম স্টেশনে। বিচারে সন্তোষের ফাঁসি হয়, প্রিয়তোষকে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়। অনাথবন্ধু তার ছেলের ফাঁসি রোধ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধিকে অনুরোধ করেন, ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানাতে। কিন্তু গান্ধিজি সেই আবেদন করতে অস্বীকার করেন কারণ—

> *গুলি চালিয়ে যে মানুষ মেরেছে তার জন্য আবেদন জানালে গান্ধীজির সারা জীবনের অহিংসা নীতির অবমাননা হত। ... গান্ধীজি ওঁদের দেশপ্রেমকে স্বীকার করেন, পথটাকে নয়।* [১৩২]

এদিকে প্রিয়তোষ ষোলো বছর আন্দামান জেলে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। আন্দামান জেলে থাকাকালীন সে বাংলার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলায় শুরু হয়েছে তেভাগা আন্দোলন। জমিদার শ্রেণির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় অঘোর রায়ের মতো জমিদাররা স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলনকে পিষে মারার প্রচেষ্টা করতে থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পটভূমিতে দেখতে পাই ১৯৪৭ সালের ২ রা জুন দিল্লির ভাইস রিগাল প্রাসাদের দরবার কক্ষ, সেখানে বসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তার স্ত্রী এডুইনা ভারতের সামগ্রিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। এখানে বসেই মাউন্টব্যাটেন ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করার নীল নকশা তৈরি করেন। এতদিন ভারতবর্ষকে তারা বাহুবলে শাসন করে এসেছিল। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারে আর বাহুবলে তাদেরকে নিজেদের অধীনে রাখা সম্ভবপর নয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নতুন পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা হল অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরো করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান-এ পরিণত করা। দেশটাকে দুটো অংশে বিভক্ত করে দেশের সামগ্রিক কাঠামোকে দুর্বল করাই যার প্রধান উদ্দেশ্য।–

> *লেডি।। ...তা তোমার প্ল্যানটা কী? কী যাদুমন্ত্রে ওরা সব সুবোধ বালকের মতন তোমার প্ল্যানটা মেনে নেবে।*
>
> *মাউন্ট।। পার্টিশান। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। দুই অংশে দেশটাকে ভাগ করতে হবে।* [১৩৩]

ব্রিটিশ বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন এদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে সুকৌশলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশটাকে দুভাগ করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। জহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেসি নেতারা এবং মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, ক্ষমতা লোভের ঐকান্তিক আগ্রহ ও লোভে দেশ বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন।

ভাইস রিগাল প্রাসাদের দরবার কক্ষে একে একে উপস্থিত হন বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহেরু, আলি জিন্না। কংগ্রেসের সম্মুখ সারির দুই নেতা এবং মুসলিম লিগের প্রধানের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। আলি জিন্না কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কংগ্রেসরা মুসলিম লিগকে কোণঠাসা করবে, মুসলিমদের নির্বিচারে খুন করবে। জিন্না একের পর এক অভিযোগ করতে থাকেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও প্যাটেল ও নেহেরু অভিযোগ করতে থাকেন মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে, তাদের অভিযোগ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সমস্ত অশান্তি ও গণ্ডগোলের মূলে মুসলিম লিগ, অর্থনীতির বিষয়েও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী মুসলিম লিগের লিয়াকৎ আলি খাঁ— যে বাজেট তৈরি করেছেন যেটা একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব বাজেট বলে দাবি করেন।–

জিন্না।। আমার প্রশ্ন সোজা মিস্টার নেহেরুর কাছে। আপনি জেনারেল ওয়েভেলের সামনে কথা দিয়েছিলেন— কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ সরকার মেনে নেবেন, মুসলিম-প্রধান প্রদেশে আমাদের মন্ত্রীসভা হবে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশে কংগ্রেসের। আপনারা মেনে নিলেন এই প্রস্তাব। আপনার সই আছে সেই প্রস্তাবের ওপর। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেখতে পারেন সেই কাগজ। তার পরের দিন এই সইয়ের কালি শুকোবার আগে ২৪ শে জুলাই ১৯৪৬, বোম্বাইতে গিয়ে কেন বললেন, কংগ্রেস কোন শর্তই মানে না? আমি পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলাম এর কথায়। তারপর ইনি বেইমানি করলেন। মাউন্ট।। মিস্টার জিন্না, আজকে আমরা যা আলোচনা করার জন্য—

জিন্না।। এইরকম নীতিহীন মিথ্যাশ্রয়ী লোকের সঙ্গে মুসলিম লীগ কোন কিছুই আলোচনা করতে চায় না। আপনারা ইংরেজরা এখনো এদেশে উপস্থিত আছেন, এখনই এরা আপনাদের সামনেই এমনভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে। আপনারা চলে যাবার পর এরা মুসলিম লীগকে কিভাবে ঘায়েল করবে বুঝতে পারছেন না? মুসলিমরা নির্বিচারে খুন হবেন!

নেহেরু ।। খুনের ব্যাপারে মুসলিম লীগের কাছে কংগ্রেস শিশু।

প্যাটেল।। কংগ্রেসের কাছে হিন্দু-মুসলিমে কোনো ভেদাভেদ নেই। কংগ্রেস যেখানে সরকার চালায় সেখানে দাঙ্গা হয় না।

জিন্না। বিহারে কি বর্তমানে মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা রয়েছে? কংগ্রেসের যিনি ডিরেক্টর সেই মিস্টার গান্ধী বলেছেন : বিহারে মুসলিম মহিলাদের গণধর্ষণ করা হচ্ছে! এবং বিহার কংগ্রেসের নেতারা প্রত্যক্ষভাবে এই অত্যাচার পরিচালনা করেছেন।

নেহেরু।। ইওর এক্সেলেন্সি, মিস্টার জিন্না প্রতি মিটিঙে একই কথা বলে যান, কোনো উত্তরে তিনি কর্ণপাত করেন না।

জিন্না।। আজ পর্যন্ত আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পেরেছেন?

প্যাটেল।। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ অচল করে দিয়েছে মুসলিম লীগ। আপনার সহযোগী নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থমন্ত্রীর পদটি দখল ক'রে বসে আছেন, এবং টাকা বন্ধ করে সরকারকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে। [১৩৪]

এভাবেই তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে। মুসলিম লিগ কংগ্রেসকে যেমন দোষারোপ করেন বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তেমনি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ জানানো হয়। তর্ক-বিতর্ক-অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে সেখান থেকে আর কোনো সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অন্য উপায়ান্তর না থাকায় পাকিস্তানের দাবি ওঠে ও ভারতকে ভেঙে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—

জিন্না।। পাকিস্তান আমার সর্বনিম্ন দাবী। সেটা যদি আমরা না পাই, তবে আবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করব। সেটা ঠেকাতে পারবেন?...

মাউন্ট।। ব্রিটিশ সরকারও সিদ্ধান্তে এসেছেন— ভারতবিভাগ ছাড়া কোনো পথ নেই। [১৩৫]

এই পরিস্থিতিতে যখন দুই পক্ষ ভারত বিভাগে আগ্রহী তখন দুই তরফেরই পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এক বিচিত্র রহস্যময় ফকির মহাত্মা গান্ধি। দুই পক্ষই বুঝেছিল দেশ বিভাগ হবে কি হবে না, তা নির্ভর করছে ঐ রহস্যময় ফকিরের ওপরে। ঐ একটা লোকই পারে যা মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের সংগ্রাম সই করে দিতে। দেশবিভাগ সম্পর্কে গান্ধিজির মতামত জানতে চাওয়া হল, কিন্তু গান্ধিজি তাঁর কোনো মতামত জানালেন না। কারণ সেদিন ছিল সোমবার—

আজ সোমবার, আমার মৌন দিবস, এই দিনে আমি কথা বলি না। [১৩৬]

এই কথাগুলি একটি কাগজের টুকরোতে লিখে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংকটের পরিস্থিতি এড়িয়ে গেলেন। ফলে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল। স্বাধীন ভারত দ্বি-খণ্ডিত হল। একটি পাকিস্তান, একটি হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। হিন্দুস্থানের স্বরাষ্টমন্ত্রী হলেন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল।

সদ্য বিভক্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করছে নির্বিচারে আবার অপরপক্ষে মুসলিমরাও হিন্দুদের হত্যা করছে। হিন্দু মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের সমূলে উচ্ছেদ করছে অপরপক্ষ যেখানে মুসলিম অধ্যুষিত সেখান থেকে হিন্দুদেরও একই রকমভাবে সমূলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। রক্তের বন্যা বইছে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান জুড়ে। চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা, চিৎকার, আর্তনাদ, ছোটাছুটি, মৃত্যুর যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস কম্পিত। হিন্দু-মুসলিম পরস্পরকে হত্যার উন্মাদনায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত। এমতবস্থায় ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে গান্ধিবাদী যেসব কংগ্রেসকর্মী এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী দাঙ্গার বিরোধিতা করছেন তাদেরকে কংগ্রেস থেকে পদচ্যুত অথবা বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মাউন্টব্যাটেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন।

মৌন থেকে গান্ধিজি চোখের সামনে দেশভাগ হতে দেখলেন, তিনি হয়তো সেদিন মুখ খুললে দেশভাগটা আটকানো যেত, তা তিনি করলেন না। এই আত্মসমালোচনা তাঁকে অনবরত দগ্ধ করেছে, যখন তিনি দেখলেন হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান জুড়ে রক্তের বন্যা বইছে। দেশের এইরূপ ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষের অত্যাচারিত নিপীড়ত মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতবর্ষের স্বরাষ্টমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠি লিখে তাঁর নিজস্ব মতামত ও আগামী সিদ্ধান্তের কথা সরাসরি জানালে—

> *আমি স্থির করেছি দিল্লিতে মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দাবীতে এবং পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য টাকা ফেরৎ দেয়ার দাবীতে আমি আজ ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৮, সকাল দশটা থেকে অনশন শুরু করছি। এ-খবর তোমাকে কাল দিয়েছি, আজ লিখিতভাবে জানালাম।* [১৩৭]

গান্ধিজি যখন শুনলেন পাকিস্তান থেকে মহম্মদ আলি জিন্না চিঠি মারফত জানিয়েছেন—

> *গান্ধী সারা ভারতের মুসলিমদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তিনি যদি করাচি আসেন তবে আমি কৃতার্থচিত্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসব।* [১৩৮]

জিন্নার প্রস্তাবে গান্ধিজি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আলোচনায় বসতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। জিন্নার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও কংগ্রেসিরা দেশবিভাগের যে চক্রান্ত করেছিল সেই চক্রান্তকে তিনি ব্যর্থ করে দিতে চান—

> *আমি যাব হেঁটে। বিদ্ধস্ত পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা ক'রে যাব জিন্নাভাই-এর কাছে। তাঁর হাত চেপে ধরব। দুনিয়া দেখবে কি করে দুই বৃদ্ধ পশুশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সব আবার গড়ব, গোড়া থেকে গড়ব।... মাউন্টব্যাটেনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ক'রে দেব আমি আর জিন্না।* [১৩৯]

দেশবিভাগ হতে দিয়ে গান্ধি তার জাতকর্মের জন্য নিজেকে আত্মধিক্কারে অনবরত জর্জরিত করছেন, সেই সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধনের জন্য ও রাজনৈতিক প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হতে চাইছেন। তাঁর এই আপসহীন কঠোর সংগ্রামের পরিকল্পনায় লর্ড মাউন্টব্যাটেনসহ বল্লভভাই প্যাটেলরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মাউন্টব্যাটেন গান্ধিকে তাঁর অনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বলেন, কিন্তু গান্ধি তাতে কর্ণপাত না করে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন—

> *আর আপোস নেই। প্রাণপণ শক্তি নিয়ে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়ব। চেষ্টা ক'রে দেখব ভুল শোধরানো যায় কিনা।* [১৪০]

বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গান্ধিজি একক পদযাত্রায় বিচ্ছিন্ন বিভেদকামী মানুষের মনে সাহস ও বিশ্বাস এনে দিতে চেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতার অপব্যবহার তাদের নীতি-নৈতিকতা কোনোভাবেই গান্ধিজি মানতে পারেননি। তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাইতেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মৈত্রীর বন্ধন। তিনি যখন দেখলেন সেই সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে তিনি পদযাত্রা করবেন বলে স্থির করলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দের আশঙ্কিত হওয়ার কারণ গান্ধিজি যদি আবার পথে নামেন এবং তার নিজস্ব মতামত জানান তাহলে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই নতুন কংগ্রেসি সরকারের অপকীর্তি প্রকাশিত হবে। কংগ্রেসের কিছু ব্যক্তি ব্রিটিশের সঙ্গে চক্রান্ত করে শুধুমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্যই দেশভাগ মেনে নিয়েছিল এই বার্তা পৌঁছে যাবে পৃথিবীর কোণে কোণে। গান্ধিজির এই পদক্ষেপ কংগ্রেসের কাছে যে কতটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে চলেছে তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাই ফলস্বরূপ গান্ধি হত্যার পরিকল্পনা।

সদ্য বিভক্ত ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধির কুটিরে এসে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর অনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার আবেদন জানান। গান্ধিজি পাঞ্জাব প্রদেশের

ওপর দিয়ে সুদীর্ঘ পদযাত্রায় মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর চরম বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন— সদ্যোজাত ভারতবর্ষ নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত, আবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলছে, এমতাবস্থায় গান্ধিজি যদি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, সেটা হবে দেশদ্রোহিতার শামিল—

প্যাটেল।। আপনি আবার অনশন করছেন?

গান্ধী।। হ্যাঁ।

প্যাটেল।। আমাদের সদ্যোজাত রাষ্ট্র নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে আপনার এই আচরণ পেছন থেকে আমাদেরকে ছুরিকাঘাতের সামিল। [১৪১]

এমনকি গান্ধিজি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে ভারতের স্বরাষ্টমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করার কথাও বলেন। কোনো হুমকি, কোনা বাধা, কোনো নিষেধে গান্ধিজি দমবার পাত্র নন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের কথায় তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন নিজের কর্তব্যে আরও অবিচল থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্যাটেল এবং গান্ধিজির মধ্যে বাদানুবাদ চরমে পৌঁছে যায়, গান্ধিজি একের পর এক ক্ষমতা লোলুপ কংগ্রেসের মুখোশ খুলে ফেলতে থাকেন ও তাদের আসল স্বরূপ উন্মোচন করেন ও কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। যে পার্টিটাকে তিনি এতদিন ধরে লালিত-পালিত করেছেন সেই পার্টির সদস্যদের নির্লজ্জতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা কোনোভাবেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন—

কংগ্রেস পার্টি যে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ামাত্র এরকম হিংস্র, স্বৈরাচারী, বিশ্বাসঘাতক এবং চোর হয়ে উঠবে, তা আমি ভাবতে পারিনি কখনো। জীবনে গান্ধীর যতগুলি পরাজয় ঘটেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাকর হচ্ছে কংগ্রেস নামক সংগঠনটা। চোরের আড্ডা বা মস্তানদের ভাঁটিখানা হয়ে উঠলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমাত্র সংগঠনটি? [১৪২]

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গান্ধিজি একরকম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পার্টিটাকে আবার গোড়া থেকে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন ও উদৃপ্ত কণ্ঠে তাঁর অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলেন।–

গান্ধী।। হ্যাঁ যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনাদের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আমি এই দাঁড়ালাম। দেখা যাক কে জেতে। [১৪৩]

গান্ধিজির দেওয়া চ্যালেঞ্জ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গ্রহণ করলেন। গান্ধিজির অনমনীয় মনোভাব ও কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে গান্ধিজিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনা সফলও করেছিল।

নাটকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যে দেখা যায় ধীরে ধীরে গান্ধি হত্যার পরিকল্পনা চলছে। ভারতের স্বরাষ্টমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিরা একযোগে গান্ধি হত্যার পরিকল্পনায় অংশ নেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নানারকমভাবে চক্রান্ত করতে থাকেন গান্ধি হত্যার জন্য এবং নাথুরাম গোড্‌সে, মদনলাল পাহোয়া এবং নারায়ণ আপ্টের মতো বিশিষ্ট মানুষরা সেই চক্রান্তে শামিল হন। সেই সঙ্গে যোগদান করেন দিল্লির পুলিশ কমিশনার সাঞ্জেভি ও মুম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার নাগরওয়ালা। ষড়যন্ত্র করে স্থির করা হয় দিল্লির প্রার্থনা সভাতেই মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করা হবে। সমস্ত চক্রান্তের মূল চক্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস গান্ধি হত্যার জন্য সরাসরি উস্কানি দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হয় না, বরং তাদের ওপর থেকে পুলিশি নজরদারি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পুলিশের কাছে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে থাকে গান্ধিজিকে হত্যা করা হবে। তার পরিকল্পনা চলছে—

আমাদের পার্টি স্থির করেছে গান্ধিকে হত্যা করা হবে। [১৪৪]

গান্ধিকে হত্যা করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছেন। শুধু তাই নয় পুণে থেকে মুম্বাই, মুম্বাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা সবই জানেন, তিনি এটাকে প্রতিহত না করে বিনা বাধায় এগোতে দিতে চান। কিছু কিছু কর্তব্যপরায়ণ অফিসার গান্ধিকে বাঁচানোর জন্য, তাঁর জীবন রক্ষার জন্য একনিষ্ঠভাবে যখন উদ্যোগ নেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্তরকম শক্তি দিয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় ও প্রতিহত করেন। ক্রমশ দেখা যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে গান্ধিজির সমস্তরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করা হয় ও নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সহজে গান্ধিজিকে হত্যা করা সম্ভব হয়।

সপ্তম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, ১৯ জানুয়ারি, দিল্লির মারিনা হোটেলের পঞ্চাশ নম্বর কক্ষে মদনলাল পাথেয়া, নাথুরাম গোড্‌সে এবং নারায়ণ আপ্টে গান্ধিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এবং সেখানে স্থির হয় পরের দিন গান্ধিকে হত্যা করা হবে প্রার্থনা সভাতে—

কাল ২০শে জানুয়ারী বিকেলে গান্ধীর প্রার্থনা সভায় তাকে শেষ ক'রে দিতে হবে— এই আদেশ এসেছে। সেইজন্য আমরা বোম্বাই থেকে দিল্লি এসে পৌঁছেছি। মদনলাল, তুমি নেবে গানবাটন। এই

দেখ বিড়লাভবনের ম্যাপ, এইখানে গান্ধী বসবে বেদীর ওপর। তুমি বেদীর পেছনে এইখানটায় থাকবে। আমি থাকব বেদীর পাশে এইখানে। আমি এইভাবে হাত তুললেই তুমি বোমাটা ফাটাবে। [১৪৫]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অনুভব করেন গান্ধিজিকে হত্যা করার জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে সর্বত্র জুড়ে, এবং সেই ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে শুরু করে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও। এই ষড়যন্ত্রে কে আছেন আর কে নেই তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করে গান্ধিজির নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করার বিরোধিতা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিরাপত্তা শিথিল না করার নির্দেশও দেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চক্রান্তে ও হস্তক্ষেপে সে নির্দেশ কার্যকরী হয় না। নেহেরু এই বিরাট ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে গান্ধিজিকে প্রার্থনা সভায় যেতে নিষেধ করেন এবং গান্ধিজির নিরাপত্তা হ্রাসের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তলব করেন ও কৈফিয়ৎ দাবি করেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তার কৈফিয়েতের কোনো রূপ জবাবদিহি করে না বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল তাঁকে প্রচ্ছন্ন জীবন হানির হুমকিও দেন—

আপনি ভুলে যাচ্ছেন শুধু গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র হয়নি, নেহেরু-হত্যারও গভীর এবং ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়েছে। [১৪৬]

স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মিলে ঠিক করেন দিল্লির প্রার্থনা সভাতেই মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করা হবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ২০ তারিখে প্রথম গান্ধিজিকে হত্যা করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা পাঞ্জাবি যুবক মদনলাল পাহোয়ার ভুলে ব্যর্থ হয়ে যায়। মদনলাল পুলিশের কাছে ধরা পড়ে ও পুলিশি জেরায় মদনলাল পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয় গান্ধি হত্যার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা। বালকৃষ্ণন ও জসবন্ত সিংহের মতো সৎসাহসী নির্ভীক পুলিশ অফিসার এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তা ব্যর্থ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করে। পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা সৎ নির্ভীক নিষ্ঠাবান পুলিশদের কখনো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি। কারণ পুলিশের উপর দিককার কর্তারা রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল মাত্র ছিলেন। মদনলাল পাহোয়ার মুখ থেকে জসবন্ত সিং ও বালকৃষ্ণানের মতো সৎ পুলিশ অফিসার গান্ধি হত্যার ষড়যন্ত্রকারী নাথুরাম গোড্‌সে ও নারায়ণ আপ্টের নাম এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের নাম ও ঠিকানা জানতে পারার পর তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে চান। কিন্তু পুলিশের উচ্চপদস্থকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা ষড়যন্ত্র করে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। উৎপল দত্ত দশম দৃশ্যে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের কথা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন—

জস।। স্যার, বসারও সময় নেই। আমাদের হাতে গান্ধীহত্যার পুরো ষড়যন্ত্রের নক্‌শা এসে গেছে। অনেকগুলো অ্যারেস্ট করতে হবে।

নাগর।। ওয়ারেন্ট সই করাতে হবে তো। ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে! সময় তো একটু লাগবেই।

জস।। স্যার, নিরাপত্তা আইনে ধরুন আগে। সময় নেই। আর মোটে পাঁচ দিন। হাত ফস্কে যদি ওরা পালায় তবে গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার আর উপায় থাকবে না। পরে ওয়ারেন্ট বার করা যাবে।

নাগর।। এটা দিল্লি নয়, বম্বে। বিনা প্রমাণে এখানে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না।...

নাগর।। দেখুন, মদনলাল একটা তৃতীয় শ্রেণীর ভবঘুরে বেকার। তার কথায় সাভারকারের মতন দেশনেতাকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

জস।। (সজোরে) করতেই হবে। নইলে পাঁচদিনের মধ্যে গান্ধী খুন হবেন।

নাগর।। তাহলে দিল্লি-পুলিশ অপদার্থ। গান্ধীর প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পেরে বম্বেতে এসে যাকে তাকে ধরতে চাইছে।

বাল।। স্যার, দিল্লি পুলিশ শুধু অপদার্থ নয়, তার সর্বোচ্চ অফিসারদের কাজকর্ম ক্রমশ অপরাধমূলক হয়ে উঠছে। সেইজন্য আপনার কাছে বিনীত আবেদন রাখছি স্যার— দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে খুন হতে দেবেন না।...

জস।। স্যার, আমরা পুলিশ অফিসার, কর্তব্য আমাদের করতেই হবে! নইলে এদেশের মানুষকে মুখ দেখাব কি ক'রে? নিজেদের কাছে ছোট হয়ে বাঁচব কি ক'রে?

নাগর।। এসব বক্তৃতা এককালে আমিও খুব ঝাড়তাম। ইনস্‌পেক্টার! ওরা আমার ছেলেমেয়েকে কিড্‌ন্যাপ ক'রে খুন করবে বলছে। আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

জস।। আছে স্যার। সেই ছেলেকে মুখ দেখাতে পারব না কর্তব্য না করলে।

নাগর।। তাকে মেরে ফেলবে। আপনার উন্মাদসুলভ প্ল্যান পরিত্যাগ করুন।

জস।। না-মুনকিন স্যার, অন্তত আপ্টে আর গোড্‌সেকে ধরে নিয়ে যাবই।

নাগর।। আপনি কি আমার ছেলেমেয়ের প্রাণ নিয়ে খেলতে এসেছেন?

জস।। মানে?

নাগর।। আপনাকে যা খুশি করতে দিলে আমার কী হবে বোঝেন না?

বাল।। স্যার, এ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতবাসীর প্রাণ আপনার হাতে।

নাগর।। I am Sorry, I can't help you, I am not so brave. আপনারা এই ঘরেই থাকবেন। ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত আপনারা হাজতে থাকবেন।

জস।। ভয়ের চোটে স্বাভাবিক মানবতাবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছেন আপনি। গান্ধীজী খুন হতে যাচ্ছেন! শুনেছেন?

নাগর।। শুনেছি, শুনেছি। সেটা অতি দুঃখের কথা। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জগতে আমার ছেলেমেয়েরাই রাজ্য, গান্ধী নন। এ-ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবেন না!

জস।। On the contrary, আমরা বেরুবই। বোম্বাইয়ে দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন লক্ষ লক্ষ। এটা নৌবিদ্রোহের শহর। আমরা বেরিয়ে তাদের কাছে আবেদন করব—

নাগর।। হল্ট্! You are both under arrest!

জস।। নাগরওয়ালা সাব! কী করছেন জানেন?

নাগর।। হ্যাঁ জানি! আমি নিরুপায়। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন! গার্ড!

[রাইফেলধারী প্রহরীর প্রবেশ]

এদের হাজতে পোরো! পাঁচ দিনের জন্য আপনারা ডিটেইন্ড!

বাল।। কী অভিযোগ? কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করছেন?

নাগর।। অভিযোগ দিল্লি-পুলিশের, আমার নয়। আপনারা দুজনেই চোরাকারবারীদের সঙ্গে গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত। দিল্লি থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি ধরে ফেলছি। নিয়ে যাও এদের। [১৪৭]

পুলিশ কমিশনার নাগরওয়ালা বালকৃষ্ণ ও জসবন্ত সিংকে চোরাকারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার মিথ্যা অপরাধে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখে, যাতে গান্ধী হত্যার পরিকল্পনা সফল হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি বিকালে দিল্লির বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভাতেই গান্ধিজিকে হত্যা করা হল। গান্ধিজিকে পরপর তিনটি গুলি করে হত্যা করলেন নাথুরাম গোড্‌সে। গান্ধি হত্যা একেবারে পরিকল্পনামাফিক একটি রাজনৈতিক হত্যা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নাথুরাম গোড্‌সে-কে গ্রেপ্তারের পর বিচারের সময় গোড্‌সের স্বীকারোক্তি সেই পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক হত্যার সপক্ষে প্রমাণ দেয়—

দেখছি আপনারা পরমপূজনীয় বীর সাভারকারকেও আসামী করেছেন। ঠিকই করেছেন। আমি ছিলাম সাভারকারের আজ্ঞাবহ, আর সাভারকর ছিলেন আবার অন্য কারুর আজ্ঞাবহ। আমি সেই

শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম বোম্বাইয়ে, সাভারকর উপস্থিত ছিলেন শিখের ছদ্মবেশে।[১৪৮]

ভারতবর্ষকে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকের চক্রান্ত ও সেই চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দাঙ্গা প্রভৃতি এক অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে গান্ধিজিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিল কিছু লোভী আত্মসর্বস্ব মানুষের হাতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের কার্যকারিতা যেন উবে গিয়েছিল। যে দলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কোটি কোটি মানুষ জড়ো হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল সেই দল রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কবজায় চলে গিয়েছিল। কিছু স্বার্থপর কংগ্রেসি নেতারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। গান্ধিজির পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি কংগ্রেস দলটাকেই তুলে দিতে চেয়েছিলেন ও পথে নামতে চেয়েছিলেন, অনশন করতে চেয়েছিলেন। যার পরিণাম স্বরূপ তাকে আত্মবলিদান দিতে হয়। কংগ্রেসি নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতেই গান্ধিজিকে হত্যা করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটক সম্পর্কে বলেছিলেন—

কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আজকের নয়, তা বহু দিনের। একটা নাটক আমি লিখেছি— 'একলা চলো রে'— গান্ধী-হত্যা এবং দেশবিভাগ নিয়ে। কংগ্রেসের দালালির অন্য ইতিহাস। গান্ধী-হত্যাতে ওরা যে সবাই লিপ্ত ছিল, এইসব হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু।[১৪৯]

'একলা চলো রে' নাটকে উৎপল দত্ত গান্ধিজিকে হত্যা, ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্রান্ত ও কংগ্রেসি কিছু স্বার্থপর নেতাদের ক্ষমতালোভ নিয়ে যে ভারতের স্বাধীন দেশের ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার স্বরূপটি তিনি উন্মোচন করেছেন আলোচ্য নাটকে। ইতিহাসের সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষের লোভ-লালসার উল্লাসের দিনে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের সুগভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে গান্ধিজিই একা নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অবস্থান করে আছেন মানুষের মননে-চিন্তনে ও বিবেকের কাছে।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চোধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৮

২. তদেব, পৃ ১৬৪

৩. তদেব, পৃ ১৫৬

৪. তদেব, পৃ ১৬৪, ১৬৫

৫. তদেব, পৃ ১৬৫

৬. তদেব, পৃ ১৬৫

৭. তদেব, পৃ ১৬৯

৮. তদেব, পৃ ২০৮

৯. তদেব, পৃ ১৬৪

১০. তদেব, পৃ ১৬৮

১১. তদেব, পৃ ২২৪, ২২৫

১২. তদেব, পৃ ২০০

১৩. তদেব, পৃ ২০২

১৪. তদেব, পৃ ১৬৬

১৫. তদেব, পৃ ১৬৯

১৬. উৎপল দত্ত, 'লিটল থিয়েটার ও আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫৬, ৪৫৭

১৭. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩৭, ২৩৮

১৮. তদেব, পৃ ২৩৪

১৯. তদেব, পৃ ২৩৯

২০. তদেব, পৃ ২৫৩

২১. তদেব, পৃ ২৫২

২২. তদেব, পৃ ২৫৭-২৫৯

২৩. তদেব, পৃ ২৫৫, ২৫৬

২৪. তদেব, পৃ ২৬০

২৫. তদেব, পৃ ২৬০

২৬. তদেব, পৃ ২৫৫

২৭. তদেব, পৃ ২৬৩, ২৬৪

২৮. তদেব, পৃ ২৬৬

২৯. তদেব, পৃ ২৬৬

৩০. তদেব, পৃ ২৬৭

৩১. তদেব, পৃ ২৮২, ২৮৩

৩২. তদেব, পৃ ২৯৯, ৩০০

৩৩. তদেব, পৃ ৩৫০

৩৪. শঙ্কর শীল, 'মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলি', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৫৪

৩৫. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬৩, ১৬৪

৩৬. শঙ্কর শীল, 'উৎপল দত্তের নাটক : প্রথম পর্ব', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ২১৯

৩৭. সূত্র-৩৫, পৃ ১৬৫

৩৮. তদেব, পৃ ১৬৭

৩৯. তদেব, পৃ ১৭০

৪০. তদেব, পৃ ১৯৫, ১৯৬

৪১. তদেব, পৃ ১৯৭

৪২. তদেব, পৃ ২১০

৪৩. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর [মহালয়া], ২০০৭, পৃ ৯৮

৪৪. সূত্র-১৬, পৃ ৪৫৯

৪৫. তদেব, পৃ ৪৫৯

৪৬. সূত্র-৩৫, পৃ ২১৯

৪৭. তদেব, পৃ ২২৫, ২২৬

৪৮. তদেব, পৃ ২৩৩, ২৩৪

৪৯. তদেব, পৃ ২৪১

৫০. তদেব, পৃ ২৪১

৫১. তদেব, পৃ ২৫৯

৫২. তদেব, পৃ ২৬০

৫৩. তদেব, পৃ ২৬১

৫৪. তদেব, পৃ ২৭৭

৫৫. তদেব, পৃ ৩০৩, ৩০৪

৫৬. তদেব, পৃ ৩১৪

৫৭. সূত্র-৩৪, পৃ ৫৭

৫৮. সূত্র-১৬, পৃ ৪৫৯

৫৯. সূত্র-১৭, পৃ ৬৯

৬০. তদেব, পৃ ৬৯, ৭০

৬১. তদেব, পৃ ৭৫, ৭৬

৬২. তদেব, পৃ ৮৪

৬৩. তদেব, পৃ ৮৪

৬৪. তদেব, পৃ ৮৪

৬৫. তদেব, পৃ ৯৭

৬৬. তদেব, পৃ ১০৫, ১০৬

৬৭. তদেব, পৃ ১০৭, ১০৮

৬৮. তদেব, পৃ ১০৮

৬৯. তদেব, পৃ ১১২

৭০. তদেব, পৃ ১৩২

৭১. তদেব, পৃ ১৩৩

৭২. তদেব, পৃ ১৩৬

৭৩. সূত্র-১৬, পৃ ৪৬০

৭৪. শঙ্কর শীল, 'পিপলস লিটল থিয়েটার', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮৮

৭৫. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ ২১৯

৭৬. তদেব, পৃ ২২০

৭৭. তদেব, পৃ ২২০-২২৪

৭৮. তদেব, পৃ ২২৩

৭৯. সূত্র-৭৪, পৃ ৮৮

৮০. সূত্র-৭৫, পৃ ২৪৯

৮১. তদেব, পৃ ২২৬

৮২. তদেব, পৃ ২২৬

৮৩. তদেব, পৃ ২৪৮

৮৪. তদেব, পৃ ২৩৫, ২৩৬

৮৫. তদেব, পৃ ২৬৭

৮৬. তদেব, পৃ ২৩৮

৮৭. তদেব, পৃ ২৬৭

৮৮. তদেব, পৃ ২৬৮

৮৯. তদেব, পৃ ২৬৮, ২৬৯

৯০. সূত্র-৭৪, পৃ ৮৪

৯১. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৮

৯২. তদেব, পৃ ৮১

৯৩. তদেব, পৃ ৮২

৯৪. তদেব, পৃ ৮২, ৮৩

৯৫. তদেব, পৃ ৮৭

৯৬. তদেব, পৃ ৮৭

৯৭. তদেব, পৃ ৮৭

৯৮. তদেব, পৃ ৮৭, ৮৮

৯৯. তদেব, পৃ ১১৫

১০০. তদেব, পৃ ১১৫

১০১. তদেব, পৃ ১০০

১০২. তদেব, পৃ ১০১, ১০২

১০৩. তদেব, পৃ ১০২, ১০৩

১০৪. তদেব, পৃ ১৩১, ১৩২

১০৫. তদেব, পৃ ১৪১

১০৬. তদেব, পৃ ১৪৩

১০৭. সূত্র-৭৪, পৃ ৯২

১০৮. তদেব, পৃ ৯৩

১০৯. তদেব, পৃ ৯৪

১১০. সূত্র-৯১, পৃ ২৩০, ২৩১

১১১. তদেব, পৃ ২৩১

১১২. তদেব, পৃ ২৬২, ২৬৩

১১৩. তদেব, পৃ ২৬৪, ২৬৫

১১৪. তদেব, পৃ ২৬৬

১১৫. তদেব, পৃ ২৬৭

১১৬. তদেব, পৃ ২৬৮, ২৬৯

১১৭. তদেব, পৃ ২৭৪

১১৮. তদেব, পৃ ২৭৫

১১৯. তদেব, পৃ ২৮০

১২০. তদেব, পৃ ২৯৩

১২১. তদেব, পৃ ১৫৫

১২২. তদেব, পৃ ১৫৮

১২৩. তদেব, পৃ ১৫৭

১২৪. তদেব, পৃ ১৯৩

১২৫. তদেব, পৃ ১৬৭

১২৬. তদেব, পৃ ১৬১

১২৭. তদেব, পৃ ১৮৫, ১৮৬

১২৮. তদেব, পৃ ২১৫

১২৯. তদেব, পৃ ২১৫

১৩০. তদেব, পৃ ২২৬

১৩১. সূত্র-৪৩, পৃ ২৮৪

১৩২. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (সপ্তম খণ্ড), শোভা সেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৮৩

১৩৩. তদেব, পৃ ৩৮৭

১৩৪. তদেব, পৃ ৩৮৯

১৩৫. তদেব, পৃ ৩৯১

১৩৬. তদেব, পৃ ৩৯৫

১৩৭. তদেব, পৃ ৪০১

১৩৮. তদেব, পৃ ৪০২

১৩৯. তদেব, পৃ ৪০২

১৪০. তদেব, পৃ ৪০৩

১৪১. তদেব, পৃ ৪০৩, ৪০৪

১৪২. তদেব, পৃ ৪০৭

১৪৩. তদেব, পৃ ৪০৭

১৪৪. তদেব, পৃ ৪১৫

১৪৫. তদেব, পৃ ৪১৭

১৪৬. তদেব, পৃ ৪৩১

১৪৭. তদেব, পৃ ৪২৭, ৪২৮

১৪৮. তদেব, পৃ ৪৩৩

১৪৯. সূত্র-৭৪, পৃ ১১০